যারা বায়োবট

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১. কিরীণা

আমার নাম কুনিল। আমার বয়স আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমি সব সময়েই ভান করি যে আমি নিঃসন্দেহে জানি আমার বয়স পনেরো। কিরীণার সাথে যখন কথা হয় সে অবশ্য সেটা স্বীকার করতে চায় না। তার সাথে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু সুযোগ পেলেই কিরীণা এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার সাথে তর্ক শুরু করে দেয়। বড় বড় চোখগুলো আরো বড় করে বলে, না কুনিল, তোমার বয়স তেরো বছরের একদিনও বেশি হতে পারে না, এই দেখ তুমি আমার থেকে অন্তত তিন সেন্টিমিটার ছোট।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, এই সময়টাতে মেয়েরা ছেলেদের থেকে দ্রুত বড় হয়।

কোন সময়টাতে?

বয়ঃসন্ধির সময়। যখন মেয়েদের ভেতরে নানারকম শারীরিক পরিবর্তন হয়।

কী রকম শারীরিক পরিবর্তন?

আমি কিরীণার বুকের দিকে তাকিয়ে তার একটি শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করলেও সেটা মুখ ফুটে বলতে পারি না। কিরীণা তবুও চোখ পাকিয়ে বলে, অসভ্য।

আমি মোটেও অসভ্য নই। আমি সব বই পড়ে শিখেছি।

অসভ্য বই।

বই কখনো অসভ্য হতে পারে না। মনে আছে পীতরোগের মহামারীর সময় কী হয়েছিল?

কিরীণা চুপ করে রইল। দুই বছর আগে পীতরোগের মহামারীতে প্রত্যেকটা পরিবার থেকে অন্তত এক জন করে শিশু মারা গিয়েছিল। তখন মধ্য অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট করে একটি বই এই অঞ্চলে আনা হয়েছিল। সেই বইটিতে পীতরোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত–প্রণালী বর্ণনা করা ছিল। পাথরকুচি গাছের পাতার রসে লিলিয়াক ফুলের পরাগ এবং চার বিন্দু পটাশ। দিনে তিনবার। দুই সপ্তাহের মাঝে পীতরোগের মহামারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিরীণা তখন জিজ্ঞেস করে, তুমি অনেক বই পড়েছ কুনিল?

আমি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম।

তোমার ভয় করে না? যখন ট্রনেরা আসবে তখন কী হবে?

এলে আসবে। আমি ট্রনদের ভয় পাই না।

কিরীণা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রনদের ভয় পায় না সেরকম মানুষ আর কয়জন আছে? আমার খুব ভালো লাগে। আমি কিরীণার হাত ছুঁয়ে বলি, তুমি ভয় পেয়ো না। আমার কিছু হবে না। যখন ট্রনেরা আসবে তখন আমি পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে?

পাহাড়ে আমার গোপন জায়গা আছে। কেউ খুঁজে পাবে না।

কিন্তু ট্রনদের যে অনুসন্ধানী রবোট আছে?

আমি গলা নামিয়ে বলি, অনুসন্ধানী রবোটও খুঁজে পাবে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

কিরীণা খানিকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, তুমি একদিন আমাকে একটা বই এনে দেবে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি পড়বে?

হ্যাঁ।

সত্যি?

সত্যি। দেবে এনে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, কেন দেব না। এক শ' বার এনে দেব। কিন্তু তুমি পড়বে কেমন করে? তোমার কম্পিউটারে কি ক্রিস্টাল রিডার আছে?

কিরীণা মুখ কালো করে বলল, না, নেই।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমারটা দেব। খুব সাবধান কিন্তু। কেউ যেন জানতে না পারে।

জানবে না, সবাই যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন পড়ব।

কিরীণা একটু পরে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে কী বই এনে দেবে কুনিল?

আমার কাছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির বই আছে, নিউক্লিয়ার ফিউসান, সুপার লেজার, আন্তঃগ্রহ যোগাযোগ, ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া—

কিরীণা একটু লাল হয়ে বলল, ঐ অসভ্য বইটা—

ও! মানব জন্মরহস্য? ঐটা আমার কাছে নেই, ইলির কাছ থেকে আনতে হবে।

থাক তাহলে।

আমি তোমাকে আরেকটা খুব ভালো বই এনে দেব। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, খুব চমৎকার বই।

ঠিক আছে।

নাকি সহজ ইলেকট্রনিক্স? সহজ ইলেকট্রনিক্স যদি তুমি ঠিক করে পড়, তা হলে ঘরে বসে তুমি উপগ্রহ স্টেশন তৈরি করতে পারবে। ট্রনদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবে।

তুমি দেখেছ?

একবার।

কেমন দেখতে? কিরীণা চোখ বড় বড় করে বলল, ট্রনদের মেয়েরা নাকি সব সময় নিও পলিমারের কাপড় পরে?

আমি জানি না। কাপড় তো কাপড়ই! পলিমারও কাপড়, নিও পলিমারও কাপড়। ইস্! আমাকে যদি কেউ একটা নিও পলিমারের পোশাক দিত!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ছিঃ, এসব বলে না কিরীণা। কেউ শুনলে কী ভাববে?

কিরীণা বিষণ্ন মুখে বলল, আমার আর পশুদের মতো থাকতে ভালো লাগে না। কেন সব আনন্দ ট্রনদের জন্যে হবে, আর সব দুঃখ-কষ্ট হবে আমাদের? কেন?

আমি কিরীণার হাত ধরে বললাম, ছিঃ কিরীণা! এইসব বলে না। ছিঃ! তুমি বললে না, তুমি কোন বই চাও? পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, নাকি সহজ ইলেকট্রনিক্স?

কিরীণা অন্যমনস্কভাবে বলল, তোমার যেটা ইচ্ছা।

আমি আরো কিছুক্ষণ কিরীণার সাথে বসে থাকলাম। তারপর কিরীণা তার জীর্ণ আইসোটোপ আইসোলেটর নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে চলে গেল। সমুদ্রের বালুতে খুব অল্প প্লুটোনিয়াম রয়েছে, ছেঁকে আলাদা করলে আমাদের একমাত্র নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরে বিক্রি করা যায়। কমবয়সী মেয়েরা তাই করে সারাদিন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করলে যেটুকু প্লুটোনিয়াম আলাদা করতে পারে, সেটা দিয়ে একদিনের খাবারও কেনা যায় কি না সন্দেহ। তবু ঘরে বসে না থেকে তাই করে মেয়েরা।

আমি বসে বসে দেখলাম, কিরীণা তার জীর্ণ আইসোটোপ আইসোলেটর দুলিয়ে দুলিয়ে সমুদ্রের তীরে হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় একটা লাল স্কার্ফ বাঁধা। বাতাসে উড়ছে সেটি। সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে তাকাল আবার, তারপর হাত নাড়ল আমার দিকে তাকিয়ে। আমিও হাত নাড়লাম। কিরীণাকে আমার বড় ভালো লাগে।

দিনের বেলা আমি খামারের কাজ করি। খুব অল্প খানিকটা জমিতে চাষ-আবাদ করা যায়। সেটা খুব যত্ন করে ব্যবহার করা হয়। যারা বড়, তারা জমি চাষ করা, সার দেয়া, বীজ বোনা এইসব খাটাখাটনির কাজগুলো করে। আমরা, যাদের অভিজ্ঞতা কম, তারা ছোট ছোট গাছের চারাগুলোর দেখাশোনা করি। ঘরে তৈরি করা গ্রোথ মনিটর দিয়েচারাগুলোকে পরীক্ষা করি। পুরানো শুকনো পাতা টেনে ফেলি, নতুন পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে-মুছে রাখি। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে এই গাছগুলোকে তৈরি করা হয়েছে, বড় একটা গাছে একদিনে এক জন মানুষের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার বের হয়ে আসে। সমস্যা হচ্ছে পানি এবং সার। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পানি টেনে আনা হয় অনেক কষ্ট করে। সার কোথা থেকে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মধ্য অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট করে গোপনে সার আনার চেষ্টা করা হয়। বহুদিন থেকে সার তৈরি করার উপর একটা বই খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

সূর্য ডুবে গেলে আমি বাসায় ফিরে আসতে থাকি। আমার বাসা একেবারে অন্য পাশে। অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে আসতে হয়। আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের প্রায় সবারই বাই-ভার্বাল আছে। সত্যিকার বাই-ভার্বাল নয়, ছোট একটা ইঞ্জিনের সাথে জোড়াতালি দেয়া কিছু যন্ত্রপাতি। সত্যিকার বাই-ভার্বাল যেরকম যতক্ষণ খুশি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে; এগুলো সেটা পারে না। ছেলেরা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে যায়, সেকেন্ড খানেকের মাঝে আবার নিচে নেমে আসে, আবার পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে যেতে হয়। একটা অতিকায় ঘাসফড়িঙের মতো ঘরে তৈরি করা বাই-ভার্বালগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে দূরত্ব অতিক্রম করে।

আমার বাই-ভার্বাল নেই, খামারের কাজ করে আমার যেটুকু সঞ্চয় হয়েছিল,

সেটা দিয়ে আমি ক্রিস্টাল রিডার কিনেছি। ক্রিস্টাল রিডার বেআইনি জিনিস, গোপনে কিনতে হয়। সে কারণে তার অনেক দাম। ইলি অবশ্যি আমাকে খুব কম দামে দিয়েছে। ইলি মনে হয় আমাকে একটু পছন্দই করে। আমি বাসায় যাবার আগে প্রতিদিন সন্ধেবেলা ইলির বাসায় একবার উঁকি দিয়ে যাই।

ইলির বাসায় সব সময়েই কেউ–না–কেউ থাকে। আজকেও ছিল। খামারের দু'জন, ক্রুড়িন আর দুরিণ, নিউক্লিয়ার রি–অ্যাক্টরের শুলা এবং রুখ নামে এক জন মেকানিক। আমাকে দেখে ইলি সস্নেহে বলল, কি খবর কুনিল? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছুদিনের মাঝেই এক জন বড়মানুষে পরিণত হবে!

ইলি কী ভাবে জানি বুঝতে পেরেছে আমার খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবার ইচ্ছে। মাঝে মাঝে তাই আমাকে এই কথাটি বলে।

রুখের কপালের দু' পাশের চুল সাদা হয়ে এসেছে। মাথা নেড়ে বলল, কুনিল যদি তার বাবার মতো হয়, তাহলে সে যে অত্যন্ত সুপুরুষ হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শুলা বলল, চেহারার প্রয়োজন নেই, কুনিল যেন তার বাবার বুদ্ধি আর জ্ঞানটুকু পায়।

সবাই তখন একসাথে মাথা নাড়ে। ক্রুড়িন আস্তে আস্তে বলে, তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি এখনো কুশানের অভাবে অভ্যস্ত হতে পারি নি।

কুশান আমার বাবার নাম। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার জন্মের আগেই আমার বাবাকে ট্রনেরা মেরে ফেলেছিল। এই এলাকায় মানুষদের মাঝে যে ছোট সভ্যতাটি গড়ে উঠেছে, সেটি নাকি আমার বাবার প্রচেষ্টার ফসল। ট্রনেরা ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে বা যারা আমাদের মতো নানা জায়গায় বেঁচে আছে, তাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তারা কোনো কারণে সেটি করছে না। আমাদেরকে কখনোই পুরোপুরি ধ্বংস করে নি সত্য, কিন্তু তারা কখনোই চায় না আমরা সভ্য মানুষের মতো থাকি। তারা চায় আমরা পশুর মতো বেঁচে থাকি, নিজেদের মাঝে খুনোখুনি করে একে অন্যকে ধ্বংস করে। তাই মাঝে মাঝে তারা এসে আমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। নির্মমভাবে মানুষদের হত্যা করে। আগে হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। আমাদের এই ছোট সভ্যতাটি গড়ে ওঠার পর হত্যাকাণ্ডগুলো বিক্ষিপ্ত নয়, এখন হত্যাকাণ্ডগুলো সুচিন্তিত। যারা নেতৃত্ব দেয় বা দিতে সক্ষম, তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়। আমাদের বই পড়া নিষেধ, যারা বই পড়ে তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়। আমাদের যে লাইব্রেরি ছিল, তার প্রত্যেকটি বইকে ধ্বংস করা হয়েছে। আজকাল তাই প্রকাশ্যে বই পড়া হয় না। বই পড়তে হয় গোপনে। সবাই পড়ে না, যাদের সাহস আছে শুধু তারাই পড়ে।

আমার বাবার চেষ্টায় এখানে একটি ছোট সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যত ছোটই হোক, এটা আমাদের নিজেদের সভ্যতা। আমরা একে–অন্যকে ধ্বংস করে বেঁচে থাকি না। সবাই মিলে একসাথে বেঁচে থাকি। শেষবারের ট্রনদের ভয়ংকর আক্রমণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার সবকিছু গোড়া থেকে তৈরি করতে হয়েছে। সেটি উল্লেখযোগ্য নয়, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, সবাই একতাবদ্ধ থেকে আবার সবকিছু গড়ে তুলেছে। কেউ আর বিক্ষিপ্ত পশুর জীবনে ফিরে যায় নি।

সবাই মনে করে এর পুরো কৃতিত্বটুকু আমার বাবার। সমুদ্রতীরে বাবার শরীরটিকে অ্যাটমিক ব্লাস্টার দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবার আগে বাবা নাকি ছোট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ট্রনেরা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না, বুঝতে পারলে বাবাকে তারা সেই কথাগুলো বলতে দিত না। বাবা তখন বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে ট্রনদের যতটুকু অধিকার, আমাদের ঠিক ততটুকু অধিকার। আমরা যদি একতাবদ্ধ থাকি, শুধু তাহলেই ট্রনেরা আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। শুধু যে ধ্বংস করতে পারবে না তা-ই নয়, আমরা আবার আমাদের অধিকার নিয়ে ট্রনদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। বাবা সবাইকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন সবাইকে পাল্টে দিয়েছে। আগে বেঁচে থাকা ছিল অর্থহীন, এখন বেঁচে থাকার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। এখানকার সব মানুষের বাবার জন্যে তাই রয়েছে এক আশ্চর্য ভালবাসা। আমি বুঝতে পারি সেই ভালবাসার অংশবিশেষ আমার জন্যেও সবার বুকের মাঝে আলাদা করে রাখা আছে।

ইলি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কুনিল, তুমি খাবে একটু গরম পানীয়?

আমি মাথা নাড়লাম। ইলি চমৎকার একধরনের পানীয় তৈরি করে, খানিকটা ঝাঁঝালো খানিকটা মিষ্টি উষ্ণ একধরনের তরল। একবারে খাওয়া যায় না, আস্তে আস্তে খেতে হয়। খাওয়ার পর সারা শরীরে একধরনের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে, কেমন জানি সতেজ মনে হতে থাকে নিজেকে। পানীয়টি ছোটদের খাওয়ার কথা নয়—ইলি তবুও মাঝে মাঝে আমাকে খেতে দেয়।

ইলির রান্নাঘরে খাবার টেবিল ঘিরে বসে সবাই কথা বলতে থাকে। বেশির ভাগই নানা ধরনের সমস্যার কথা, কেমন করে সমাধান করা যায় তার আলোচনা। আমি এক কোনায় বসে বসে শুনি। খুব ভালো লাগে শুনতে। ভারি ইচ্ছে করে আমার বড় হতে, তাহলে আমিও তাদের মতো কঠিন কঠিন সব সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারব।

পানীয়টি শেষ করে আমি উঠে পড়ি। ইলি আবার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আগের বইটি শেষ হয়েছে?

একটু বাকি আছে। এক্সপেরিমেন্টের অংশটা করতে পারলাম না।

ইলি মাথা নাড়ল, পরের বার দেখি জোগাড় করা যায় কী না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, ইলি, মানব জন্মরহস্য বইটা আমাকে আবার দেবে?

ইলি চোখ মটকে বলল, কেন, আবার কেন?

কিরীণা পড়তে চেয়েছিল—বলতে গিয়ে আমার কান লাল হয়ে ওঠে।

ইলি শেলফ থেকে একটা ছোট ক্রিস্টাল বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

আমি পকেটে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে, মনে হয় কোনো এক জন মানুষ কাকুতি-মিনতি করে কিছু একটা চাইছে। পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমি বাসায় ফিরে যেতে থাকি। আমার মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে কাজ করেন মা, কন্ট্রোল রুমে বসে বসে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করেন সবকিছু। ছোট ছোট সুইচ রয়েছে, ছোট ছোট হাতল, মা এবং আরো কয়েকজন মহিলা সেগুলো আলতোভাবে

স্পর্শ করে রাখে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে হাত দিয়ে পুরো রি–অ্যাক্টরটিকে বন্ধ করে দিতে হবে। একটু ভুল হলে পুরো রি–অ্যাক্টর আর আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে।

কোনোভাবে যদি একটা ভালো কম্পিউটার চুরি করে আনা যেত ট্রনদের থেকে!

কিরীণার বাসার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমি সবসময় ঝাউগাছের নিচে একবার দাঁড়াই। সমুদ্রের বাতাসে ঝাউগাছের পাতা শিরশির করে কাঁপতে থাকে, কেমন যেন কান্নার মতো একটা শব্দ হয়। অকারণে কেমন জানি মন–খারাপ হয়ে যায়। আমি চুপচাপ তাকিয়ে থাকি। রান্নাঘরে চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে কিরীণা রান্না করছে। আগুনের লাল আভা পড়েছে মুখে, নিচের ঠোঁট কামড়ে বড় একটা পাত্রে ফুটন্ত কী একটা ঢেলে দিল, এক ঝলক বাষ্প বের হয়ে এল সাথে সাথে। হাতের বড় চামচটা নিয়ে সে নাড়তে থাকে দ্রুত।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। আমার বড় ভালো লাগে কিরীণাকে দেখতে।

২. ট্রন

কিরীণা মাথার লাল স্কার্ফটি খুলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। আকাশে ঘন কালো মেঘ, সমুদ্র ফুঁসে উঠেছে একধরনের উন্মত্ততায়। আমি ডাকলাম, কিরীণা—

কিরীণা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল উপাসনার ভঙ্গিতে। উত্তাল সমুদ্র থেকে ভয়ংকর একটি ঢেউ ছুটে আসছে কিরীণার দিকে। আমি আবার ডাকলাম, কিরীণা—

ঢেউটি এসে আঘাত করল কিরীণাকে। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল উত্তাল সমুদ্রে। কিরীণা আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি ছুটে গেলাম, কিন্তু কিরীণা ভেসে গেল আরো গভীরে।

কিরীণা চিৎকার করে ডাকল আমাকে। তার গলা থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর বের না হয়ে শঙ্খের মতো শব্দ হল। গাঢ় ভরাট একটি অতিমানবিক ধ্বনি, আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি হঠাৎ। সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে, বুকের মাঝে ঢাকের মতো শব্দ করছে হৃৎপিণ্ড। মনে হচ্ছে বুক ফেটে বের হয়ে আসবে হঠাৎ।

শঙ্খের মতো শব্দটি শুনতে পেলাম আবার। ভয়ংকর করুণ একটি শব্দ। মনে হল পৃথিবীর সব মানুষ করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে সৃষ্টিজগতের কাছে। কিসের শব্দ এটি? আমি পায়ে পায়ে বিছানা থেকে নেমে আসি। বাইরের ঘরের জানালা খোলা, মা দাঁড়িয়ে আছেন খোলা জানালার সামনে। চুল উড়ছে সমুদ্রের বাতাসে, দুই হাতে জানালার পাল্লা ধরে অশরীরী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন মা। কেন জানি আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি ভয়–পাওয়া গলায় ডাকলাম, মা।

মা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। জ্যোৎস্নার নীল আলোতে মাকে মনে হচ্ছে অন্য কোনো জগতের প্রাণী। ঠিক তখন আবার সেই শঙ্খের আওয়াজ ভেসে

এল দূর থেকে। রক্ত–শীতল–করা ভয়ংকর করুণ একটি ধ্বনি।

আমি আবার ডাকলাম, মা—

কি বাবা?

ওটা কিসের শব্দ?

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সাইরেন।

সাইরেন কেন বাজে মা?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে, তারপর বললেন, আজ আমাদের খুব দুঃখের দিন বাবা। খুব দুঃখের দিন।

কেন মা?

ঐ যে সাইরেনের আওয়াজ হচ্ছে, তার অর্থ হল, বিশাল এক ট্রন বাহিনী আসছে আমাদের কাছে।

থরথর করে কেঁপে উঠলাম আমি আতঙ্কে। মা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, বাবা আমার, সোনা আমার, কোনোদিন তোকে আমি বলি নি আমি তোকে কত ভালবাসি। কাল যদি আমি মরে যাই, তুই জেনে রাখিস, তুই ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো আপনজন নেই। পৃথিবীর সব ভালবাসাকে একত্র করলে যত ভালবাসা হয়, আমি তোকে তার থেকেও বেশি ভালবাসি। আর—আর—

মায়ের গলার স্বর কেঁপে উঠল হঠাৎ, ভাঙা গলায় বললেন, কাল যদি তুই মরে যাস, আমায় ক্ষমা করে দিস বাবা এমন একটা পৃথিবীতে তোকে জন্ম দেয়ার জন্যে। আমায় ক্ষমা করে দিস।

আবার ভয়ংকর করুণ রক্ত–শীতল–করা শঙ্খের ধ্বনি ভেসে এল দূর থেকে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু হু করে, তার মাঝে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। ছোট বাচ্চাদের মায়েরা গরম কাপড়ে জড়িয়ে দিয়েছে। ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনার জন্যে কেউ কেউ মৃদু আপত্তি করছে, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। আমি মায়ের হাত ধরে একটা ঝাউগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই বের হয়ে এসেছে, ছড়িয়ে–ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পালিয়ে যাবার কোনো স্থান নেই এদের হাত থেকে। ইলি নতুন একটা জ্যামার তৈরি করার চেষ্টা করছে, যেটা দিয়ে অনুসন্ধানী রবোটদের বিভ্রান্ত করে দেয়া যাবে, কিন্তু সেটা তৈরি শেষ হয় নি। সব যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে আরো বছরখানেক লেগে যাবার কথা, সেটা তৈরি করতে পারলে এক জন দু'জন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে পাহাড়ে লুকিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু সেটা এখনো তৈরি হয় নি, আগেই ট্রনেরা চলে এসেছে। পুরোপুরি এখন আমাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। কে জানে কী করবে ট্রনেরা! কতজন মানুষকে মারবে, কী ভাবে মারবে!

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় যেন অদৃশ্য কোনো বক্তা কথা বলছে আর সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার কথা। হালকা কুয়াশায় মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে সবাই। শিশুগুলোও জানি কেমন করে বুঝে গেছে ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটবে কিছুক্ষণের মাঝে। কেউ আর কাঁদছে না, বিরক্ত করছে না, চুপ করে অপেক্ষা করছে মায়ের হাত ধরে।

প্রথমে এল একটা ছোট প্লেন। খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল সেটি, ইতস্তত কয়েকটি

বিস্ফোরক ফেলল আশেপাশে। প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরণ হল। আগুনের হলকা উঠে গেল আকাশে। মা ফিসফিস করে বললেন, ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। সব সময় ভয় দেখায় প্রথমে।

এরপর মাঝারি আকারের একধরনের প্লেন উড়ে এল, দেখে মোটেও প্লেন মনে হয় না, মনে হয় কোনো বড় জাহাজ ভুল করে আকাশে উঠে গেছে। এই প্লেনগুলো থেকে প্যারাসুটে করে ছোট ছোট রবোট নামতে থাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে। মা আবার ফিসফিস করে বললেন, অনুসন্ধানী রবোট।

রবোটগুলো আমাদের সবাইকে ঘিরে নেয় প্রথমে, তারপর আরো কাছাকাছি একত্র করে আনে। কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কারণ ইতস্তত গুলির আওয়াজ আর মানুষের আর্তনাদ শোনা যেতে থাকে কিছুক্ষণ। একসময়ে আবার নীরব হয়ে যায় চারদিক। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, সবাইকে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে অনুসন্ধানী রবোট।

ট্রনেরা এল ছোট ছোট দলে, চমৎকার একধরনের মহাকাশযানে করে। ধবধবে সাদা মহাকাশযান, দু'পাশে ছোট দুটি পাখা, পিছনে শক্তিশালী ইঞ্জিন। সমুদ্রের বালুতটে খুব সহজে নেমে স্থির হয়ে যায় মহাকাশযানগুলো। দরজা খুলে নেমে আসে ট্রন নারী–পুরুষ। আমি আগে কখনো ট্রন দেখি নি, ভেবেছিলাম তাদের চেহারা হবে ভয়ংকর নিষ্ঠুর। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম তারা দেখতে ঠিক আমাদেরই মতো, হয়তো গায়ের রং একটু স্বচ্ছ, চোখের রং গাঢ় নীল, নাকটা একটু বেশি ঋজু, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ট্রন নারী–পুরুষেরা নেমে সমুদ্রের পানিতে খেলা করতে থাকে, বালুতট থেকে ঝিনুক কুড়ায়, হালকা স্বরে হাসি–তামাশা করে পানীয়তে চুমুক দেয়। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। দেখে একটি বারও মনে হয় না কোনো নৃশংস অভিযানে এসেছে এই হাসিখুশি মানুষগুলো।

সাহায্যকারী রবোট এসেছে বেশ কয়টি। সেগুলো এর মাঝে কয়টি বড় বড় টেবিল পেতেছে সমুদ্রতটে। কিছু যন্ত্রপাতি দাঁড় করিয়েছে আশেপাশে, আশ্চর্য সুন্দর সেই সব যন্ত্রপাতি, কী কাজে আসে কে জানে! ছোট ছোট উজ্জ্বল রঙের কয়েকটা ঘর তৈরি করল কিছু টেবিলকে ঘিরে। কিছু বিচিত্র ধরনের বাক্স নামাল মহাকাশযান থেকে। উজ্জ্বল কিছু খাঁচা। দেখে মনে হতে থাকে সমুদ্রতীরে আজ বুঝি মেলা বসেছে।

রবোটগুলো আশ্চর্য দক্ষতায় তাদের কাজ শেষ করে একপাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। ট্রনগুলো তখন কাজ শুরু করে নিজেদের। কয়েকজন ধবধবে সাদা পোশাক পরে ছোট ছোট ঘরগুলোতে ঢুকে পড়ে। অন্যেরা টেবিলের পাশে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে। কয়েকজন হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের পিছে পিছে থাকে দেহরক্ষী রবোট।

একটি ট্রন মেয়ে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। হেঁটে হেঁটে আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। এত কাছে যে আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই। একমাথা কালো চুল সমুদ্রের বাতাসে উড়ছে। স্বচ্ছ কোমল গায়ের রং, গাঢ় নীল চোখ, লাল ঠোঁট। কী চমৎকার শরীর মেয়েটির। নিও পলিমারের পোশাকে ঢাকা সুঠাম দেহ। ভরাট বুক নিঃশ্বাসের সাথে উঠছে–নামছে। মেয়েটি আমাদের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়—তার দৃষ্টি স্থির হয় কিছু শিশুর উপর। আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় তাদের। কিছু একটা বলে ট্রন

ভাষায়, মনে হয় সুরেলা গলায় গান গাইছে কেউ।

দেহরক্ষী রবোটগুলো এবারে এগিয়ে আসে শিশুদের দিকে, হাতের অস্ত্র তাক করে।

আমাদের ঠিক পাশেই ছিল লাবানা তার তিন বছরের মেয়ে ইলোনাকে নিয়ে। হঠাৎ সে ইলোনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে, না-না—

ট্রন মেয়েটি এক হাতে তার অস্ত্রটি লাবানার দিকে তাক করে গুলি করল আশ্চর্য দক্ষতায়। শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ হল, আর লাবানা ছিটকে পড়ল বেলাভূমিতে। টকটকে লাল রক্তে ভিজে গেল খানিকটা মাটি।

আমি এর আগে কখনো হত্যাকাণ্ড দেখি নি, গা গুলিয়ে বমি এসে গেল হঠাৎ। লাবানার দেহ ছটফট করছে, তার মাঝে দেহরক্ষী রবোট এসে এক হ্যাঁচকা টানে ইলোনাকে টেনে সরিয়ে নিল। চিৎকার করে কাঁদল ইলোনা, আম্মু—আম্মু গো—

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। মাকে শক্ত করে ধরে রেখেছি আমি, মা কাঁপছেন থরথর করে, ফিসফিস করে বলছেন, হে ঈশ্বর, পরম সৃষ্টিকর্তা, দয়া কর—দয়া কর—রক্ষা কর এই নৃশংস পশুদের থেকে।

আমি ভেবেছিলাম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব আমি। কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই কেমন জানি বোধশক্তিহীন হয়ে গেলাম। নিষ্ঠুরতা আর হত্যাকাণ্ড দেখে কেমন জানি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। চোখের পলক না ফেলে দেখলাম কী অবলীলায় ট্রন নারী-পুরুষেরা মানুষ হত্যা করে, দেহরক্ষী রবোটেরা কোনো শিশুকে সরিয়ে নেবার সময় তাদের বাবা-মা যদি এতটুকু বাধাও দিয়েছে, সাথে সাথে হত্যা করেছে তাদের।

সব শিশুদের সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে। এক জন এক জন করে পরীক্ষা করছে ট্রন মানুষেরা তাদের বিচিত্র যন্ত্র দিয়ে। তারপর পাশের ঘরগুলোতে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে কী করছে তাদের? রক্ত-শীতল-করা স্বরে আর্তনাদ করছে কেন শিশুগুলো?

ঘরগুলোর ভেতর থেকে সাহায্যকারী রবোটেরা মাঝারি আকারের কিছু বাক্স মহাকাশযানে তুলতে থাকে। কী আছে ঐ বাক্সগুলোতে?

আমরা কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। একসময় লক্ষ করি, ট্রনদের একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু পুরুষ এবং কিছু রমণী, আলগোছে একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে হাতে, হাসতে হাসতে কথা বলছে তারা। আমাদের কাছাকাছি এসে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়। কী খুঁজছে, কাকে খুঁজছে কে জানে। মা ফিসফিস করে বললেন, সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে এখন।

সত্যিই তাই। আবিনাকে ধরে নিয়ে গেল, দুরিণের বড় মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেল, শুকে ধরে নিয়ে গেল। শুধু সুন্দরী মেয়ে নয়, সুদর্শন পুরুষদেরও ধরে নিয়ে গেল ট্রনেরা। ক্রিকি বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল, সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলল তাকে। খাঁচার মতো কিছু জিনিস নামিয়েছিল, এখন বুঝতে পারলাম কেন। মানুষকে যখন পশুর মতন খাঁচায় ভরে নেয়া হয়, তার থেকে হৃদয়হীন করুণ কোনো দৃশ্য হতে পারে না। খাঁচারশিকগুলো ধরে রেখে পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল আবিনা। দাঁড়িয়ে রইল দুরিণের বড় মেয়েটি। দাঁড়িয়ে রইল শু। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম আবার, শুনতে পেলাম মা বলছেন ফিসফিস করে, শক্তি দাও হে সৃষ্টিকর্তা, শক্তি দাও, শক্তি—

মহাকাশযানে সবকিছু তুলে নেয়া হয়েছে।

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই গুলি শুরু হল। মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছে দমন করে আমি চোখ বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে, মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আসে। আমি তার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ইচ্ছে করলেই সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে। সে কি আমাকে স্পর্শ করবে? আলিঙ্গন করবে?

হঠাৎ মনে হল কিছু আসে-যায় না। আমি বেঁচে থাকি বা মরে যাই কিছুতেই কিছু আসে-যায় না। আমি চোখ খুলে তাকালাম। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে আগুনের ফুলকির মতো বুলেট ছুটে আসছে আমাদের দিকে। যারা গুলি করছে তাদের মুখের দিকে তাকালাম। তাদের চোখে কৌতুক। তাদের মুখে হাসি। আমি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মা সত্যিই বলেছেন। এটি একটি খেলা। অনুসন্ধানকারী রবোটগুলো উঠে গেছে তাদের বেঢপ জাহাজের মতো দেখতে প্লেনটিতে। অল্প কয়জন ট্রন দাঁড়িয়ে আছে নিচে। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে রেখেছে আমাদের দিকে। মা কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে গুলি করবে আমাদের, মেরে ফেলবে যতজনকে সম্ভব।

আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে আবার বললেন, ভয় পাস নে বাবা, মৃত্যু একবারই আসে।

আমি ভয় পাচ্ছি না মা।

যখন গুলি করা শুরু করবে তখন খবরদার মাথা নিচু করবি না, উবু হয়ে বসে যাবি না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবি না—

কেন মা?

যারা মাথা নিচু করে বা শুয়ে পড়ে, তাদের ট্রনেরা গুলি করে মেরে ফেলে সবার আগে।

কেন মা?

জানি না। মনে হয় এটা তাদের একটা খেলা। শেষ মহাকাশযানটি আকাশে উঠে যাবার পরও সবাই দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ইলি একটু এগিয়ে আসে, একটা বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বলল, যারা বেঁচে আছ তারা শোন, ঐ ঘরগুলোতে কেউ যেন না যায়—

একটি মা পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল, তাকে শক্ত করে ধরে ফেলল দু'জন।

আমার মা এগিয়ে গেলেন ইলির দিকে। ইলি উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল মায়ের দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল সে চিনতে পারছে না মা'কে। এক জন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। ইলি ভাঙা গলায় বলল, আবার কি দাঁড়াতে পারব আমরা? পারব?

মা মাথা নাড়লেন, পারতে হবে ইলি।

ভয়ংকর একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। হঠাৎ—একটি মা ছুটে ঢুকে পড়েছে ঐ ঘরটিতে। কিছু একটা দেখেছে সেখানে। সবাই ছুটে যাচ্ছে এখন।

মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, কী আছে ঐ ঘরে ইলি?

ইলি ভাঙা গলায় বলল, আমি জানি না। খবর পেয়েছিলাম একটা ওষুধের বিক্রিয়ায় ট্রন শিশুদের হৃৎপিণ্ডে কী একটা সমস্যা হচ্ছে। মনে হয়—

কি?

মনে হয় বাচ্চাদের বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে নিয়ে গেছে।

আমার মা মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। দুঃখ–কষ্ট–বেদনা কিছুই আর আমাকে স্পর্শ করছে না—কিছুই না।

৩. ঝড়ের রাত

ট্রনদের আক্রমণের পর তিন মাস কেটে গেছে, সেই ভয়ংকর বিভীষিকার স্মৃতির উপর সময়ের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। তবে সবার জন্যে নয়। কয়েকটি মা সেই ঘটনার পরপরই সমুদ্রের পানিতে আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদের শিশু–পুত্র–কন্যাদের পরিণতিটুকু কিছুতেই তারা ভুলতে পারে নি। কয়েকজন মা এবং বাবার খানিকটা করে মস্তিষ্ক–বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যাদের ধরে নিয়ে গেছে, তাদের প্রিয়জনের মানসিক অবস্থা সম্ভবত আর কখনোই স্বাভাবিক হবে না। তাদের বেশির ভাগই প্রায় সর্বক্ষণ একটি গভীর যন্ত্রণার মাঝে সময় কাটায়।

অন্যেরা মোটামুটি সামলে নিয়েছে। মানুষের সহ্য করার ক্ষমতার নিশ্চয়ই কোনো সীমা নেই, বিশেষ করে দুঃখী মানুষের। আর আমাদের মতো দুঃখী মানুষ আর কে হতে পারে?

আমার মা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন। ট্রনদের আক্রমণে সেটিতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। সারতে সময় নেবে। ট্রনদের আক্রমণে অনেক শিশু অনাথ হয়েছে, মা তাদের জন্যে একটা অনাথাশ্রম খুলেছেন। আমি খামারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাকে সেখানে সাহায্য করি।

সেদিন ভোরবেলা থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘ কেটে পরিষ্কার না হয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল, তার সাথে ঝড়ো হাওয়া। মা বাইরে তাকিয়ে বললেন, কুনিল, বৃষ্টির ধরনটা ভালো লাগছে না। আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিটা কি?

আমাদের সত্যিকার কোনো রেডিও টেলিভিশন স্টেশন নেই। জরুরি প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্যে শর্ট ওয়েভে কিছু ভিডিও সিগনাল পাঠানো হয়। আলাদা করে টেলিভিশন কারো নেই, কম্পিউটারের মনিটরে ভিডিও সিগনালটি দেখতে হয়। আমি দেখার চেষ্টা করলাম, আবহাওয়া খারাপ বলে ভিডিও সিগনালটিও খুব খারাপ। তবু বুঝতে পারলাম সমুদ্রে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে আমাদের এলাকায় আসতে পারে। আমি মাকে খবরটা জানালাম। মা চিন্তিত মুখে বললেন, বাচ্চাদের তাহলে সরিয়ে ফেলা দরকার।

কোথায় সরাবে মা?

আরো ভেতরে। স্কুলঘরটা যথেষ্ট উঁচু নয়, জলোচ্ছ্বাস হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা উঁচু জায়গায় রাত কাটানো দরকার।

মা একটি রেনকোট পরে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি বললাম, দাঁড়াও মা, আমিও যাই তোমার সাথে।

যাবি? চল। মা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। এই ঝড়ো হাওয়ার মাঝে উন্মত্ত সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একা একা যেতে নিশ্চয়ই মায়ের একটু ভয় ভয় করছিল। আমার মা খুব সাহসী মহিলা, প্রয়োজন হলে খেপা সিংহীকেও খালি–হাতে জাপটে ধরবেন, কিন্তু ঝড়–বৃষ্টিকে খুব ভয় পান। আমার ঠিক উল্টো। ঝড়–বৃষ্টি আমার অসম্ভব ভালো লাগে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে যখন সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, আমি আমার রক্তের মাঝে একধরনের উন্মত্ত আনন্দের ডাক শুনতে পাই।

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে আমরা হেঁটে যাই। আকাশে কেমন একটা লালচে রং। সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছে, বড় বড় ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝড়োহাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়। আমরা যখন অনাথাশ্রমের স্কুলঘরটিতে পৌঁছেছি, তখন দু'জনেই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

বাচ্চাগুলো আমার মা'কে দেখে খুব খুশি হল। মা একটা আগুন তৈরি করে হাত–পা সেঁকে একটু গরম হয়ে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। জনা পঞ্চাশেক বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাকে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাইল দুয়েক ভেতরে একটা নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা খুব সহজ কথা নয়। যখন কাজ শেষ হয়েছে, তখন বেলা পড়ে এসেছে। কয়েকজন স্থানীয় মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে মা ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এক জন বলল, এই ঝড়–বৃষ্টিতে ফিরে যাবেন কি, রাতটা কাটিয়ে যান।

মা বললেন, না গো, ফিরে যাই। নিজের বাড়ি না হলে ঘুম আসতে চায় না।

আমরা যখন পথে নেমেছি তখন ঝড়ের বেগ আরো অনেক বেড়েছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সুচের মতো বিঁধছে শরীরে। আকাশে কেমন জানি একটা ঘোলাটে লাল রং, সমুদ্রে কালচে অশুভ ছায়া। বড় বড় ঢেউ এসে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে তীরে। আমি বুকের ভেতর একধরনের উন্মত্ততা অনুভব করি। দুই হাত উপরে তুলে ঝড়ো হাওয়ার সাথে এক পাক নেচে মাকে বললাম, কী সুন্দর ঝড়!

মা গলা উঁচিয়ে বললেন, কি বাজে কথা বলিস! ঝড় আবার সুন্দর হয় কেমন করে?

আমি মায়ের কথায় কান না দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম, আয় আয় আয়রে—আরো জোরে আয়!

মা বললেন, চুপ কর্—চুপ কর্ অলক্ষুণে ছেলে!

আমি আবার চিৎকার করে বললাম, ভেঙে ফেল সবকিছু। ধ্বংস করে ফেল পৃথিবী—

মা আমাকে ধমক দিয়ে কী–একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে গিয়ে অবাক হয়ে বললেন, কে? কে ওটা বসে আছে এই ঝড়–বৃষ্টিতে?

কোথায়?

মা হাত তুলে সমুদ্রতীর দেখালেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। সমুদ্রের তীরে বালুবেলায় গুটিসুটি মেরে কে যেন বসে আছে। এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটির গায়ে কোনো কাপড় নেই। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ একেক বার খুব কাছে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝড়ের বেগ আরো বাড়লে

লোকটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উত্তাল তরঙ্গ। মা বললেন, ডাক্ দেখি লোকটাকে।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, কে ওখানে? ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনে আমার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল, লোকটি ফিরে তাকাল না।

মা বললেন, আহা, কোনো পাগল মানুষ?

আমি বললাম, হতে পারে আত্মহত্যা করতে এসেছে।

মা আমার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বললেন, চল্ দেখি গিয়ে।

আমার মা, যিনি ঝড়-বৃষ্টি-ঘূর্ণিঝড়কে এত ভয় পান তাঁর জন্যে এই ঝড়ের মাঝে সমুদ্রতীরে যাওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাহসের কাজ। আমি দেরি না করে সমুদ্রতীরে ছুটতে থাকি। ''হে পরম করুণাময় ঈশ্বর'' জপতে জপতে আমার মা পিছু পিছু আসতে থাকেন।

মানুষটির কাছে এসে প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ল, সেটি হচ্ছে মানুষটি পুরোপুরি নগ্ন। মানুষ সাধারণত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু এই মানুষটির বসার ভঙ্গিটিতে নগ্নতা ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টা নেই। বৃষ্টির ছাঁটে সে ভিজে চুপসে গেছে, কিন্তু সে পুরোপুরি নির্বিকারভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে ওখানে?

আমার গলার স্বর শুনে লোকটি ঘুরে আমার দিকে তাকাল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর একটি তরুণ। আমি আমাদের সবাইকে চিনি, এই তরুণটি ভিন্ন কোনো অঞ্চলের। এত সুন্দর চেহারা, নিশ্চয়ই কোনো ট্রন। আমি এক পা পিছিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?

তরুণটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি পিছনে তাকালাম, মা অনেক পিছনে পড়ে গেছেন, ঝড়োহাওয়ার সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে কোনোমতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কে? কে লোকটা?

মনে হয় ট্রন।

ট্রন? মা চমকে উঠলেন, ট্রন কোথা থেকে আসবে?

দেখ না মা, চেহারা অন্যরকম।

মা এবারে কাছে এগিয়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তরুণটি কোনো উত্তর দিল না। মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ট্রন?

তরুণটি কোনো উত্তর দিল না, একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মা যে এক জন মহিলা এবং তার সামনে যে নগ্নতাকে একটু আড়াল করা দরকার, মনে হয় সেটাও সে জানে না।

দমকা হাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়ে গেল, তরুণটি শীতে একটু কেঁপে উঠে ধীরে ধীরে হাত দু'টি বুকের উপর দিয়ে নিয়ে নিজেকে শীত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বৃষ্টির পানি তার চুল ভিজিয়ে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

মা আমাকে বললেন, ছেলেটিকে বাসায় নিতে হবে, এখানে তো ফেলে রাখা যাবে না।

আমি বললাম, কেমন করে নেবে মা, মনে হয় পাগল।

মা নিজের রেনকোটটা খুলে, ভেতর থেকে চাদরটা বের করে তরুণটার কাছে

এগিয়ে গেলেন। বললেন, তুমি চল আমার সাথে। তরুণটি স্থির এবং কেমন জানি বিষণ্ন ভঙ্গীতে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মা এবারে তার হাত ধরে তোলার চেষ্টা করলেন। তরুণটি বেশ সহজেই উঠে দাঁড়াল। মা হাতের চাদরটি দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন, তরুণটি বাধা দিল না। মা আবার বললেন, তুমি এস আমার সাথে।

তার হাত ধরে আকর্ষণ করতেই তরুণটি ছোট পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে। মা তার হাত ধরে বাসার দিকে যেতে থাকেন।

রাস্তায় উঠে মা তরুণটির হাত ছেড়ে দেন, তরুণটি ছোট ছোট পদক্ষেপে আমাদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গিটিতে একটি আশ্চর্য নির্লিপ্ততা। মনে হয় পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার কোনো আকর্ষণ নেই।

প্রচণ্ড ঝড়োহাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়, তার মাঝে মাথা নিচু করে কোনোমতে বাসায় পৌঁছাই। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঘরের আলো নিবুনিবু করছে, আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারটি প্রায় প্রাগৈতিহাসিক, ঝড়-বৃষ্টি হলে বড় শর্ট সার্কিট হয়ে পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। মনে হয় আজকেও সেরকম কিছু-একটা হবে। মা ঝুঁকি নিলেন না, দেরাজ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বালিয়ে নিলেন। প্রায় সাথে সাথেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের ভিতর ছোট মোমবাতির আলোতে চাদর জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণটিকে অত্যন্ত রহস্যময় দেখাতে লাগল। সে স্থির দৃষ্টিতে মোমবাতির শিখাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় চোখের পলক পড়ছে না।

মা একটি শুকনা তোয়ালে নিয়ে এসে বললেন, বাবা, শরীরটা মুছে নাও।

তরুণটি মায়ের কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না, মা তখন নিজেই তার শরীরটা মুছে দিয়ে আরেকটা শুকনা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তরুণটি দুই হাত দিয়ে চাদরটি জড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

রাতে তরুণটি কিছু খেল না। খাবারের আয়োজন আহামরি কিছু ছিল না; স্যুপ, আলুসেদ্ধ ও শুকনা মাংস, কিন্তু তরুণটিকে খাবারের টেবিলের কাছেই আনা গেল না। মা স্যুপের বাটিটা নিয়ে তার মুখে কয়েকবার তুলে দেয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে প্রত্যেকবারই তার মুখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম, মনে হয় অনেক ভালো খাবার খেয়ে অভ্যাস, তোমার স্যুপ খেতে পারছে না।

মা উষ্ণ হয়ে বললেন, বাজে বকিস না। আমার স্যুপ যে খেয়েছে, সে কখনো তার স্বাদ ভোলে নি।

কথাটি সত্যি, শুধু স্যুপ নয়, মা সবকিছু খুব ভালো রান্না করেন।

রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝড়ের প্রকোপ আরো বেড়ে যেতে থাকে। আমি কয়েকবার ভিডিও বুলেটিনটি শুনতে চেষ্টা করলাম, ঘরে বিদ্যুৎ নেই বলে খুব লাভ হল না। ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস শুরু হওয়ার আগে পাহাড়ের চূড়োয় একটি লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, সেটি এখনো জ্বালানো হয় নি। মা প্রতি দুই মিনিটে একবার করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলছিলেন, হে করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষা কর, রক্ষা কর—

কোনো কাজ নেই বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। মা তরুণটির জন্যে একটি উষ্ণ বিছানা তৈরি করে দিলেন কিন্তু সে জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি নিজের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল মায়ের আর্তচিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি, মা হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ওঠ্, ঘুম থেকে ওঠ্, সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ—

কী হয়েছে মা? কি?

পানি আসছে। পানি—

আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম, আমাদের বাসাটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে, বড় জলোচ্ছ্বাস এলে পুরো বাসাটি পানিতে তলিয়ে যাবার কথা। আগেও কয়েকবার আমরা খুব অল্প সময়ের মাঝে বাসা ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গেছি। ব্যাপারটিতে সেরকম কোনো ভয় নেই, সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রত্যেকবারই কেমন একধরনের ফূর্তি হয়েছে। মায়ের কথা অবশ্যি ভিন্ন, তিনি আতঙ্কে অধীর হয়ে প্রত্যেকবারই মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন।

আমি উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গাঢ় অন্ধকার নেই, আবছা আলোতে বেশ দেখা যায়। সমুদ্র ফুঁসে উঠছে, বড় বড় ঢেউয়ে পানি অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। আমি পাহাড়ের উপরে তাকালাম, একটা লাল বাতি জ্বলছে এবং নিভছে। তার মানে মায়ের আতঙ্কটুকু অহেতুক নয়, সত্যি সত্যি বড় জলোচ্ছ্বাস আসছে।

আমি জুতো পরছিলাম, মা তাড়া দিলেন, এখন এত সাজগোজের দরকার কি?

সাজগোজ কোথায় দেখলে? খালিপায়ে যাব নাকি?

পাগল ছেলেটাকে নিতে হবে আবার!

আমার হঠাৎ তরুণটির কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, কী করছে মা?

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমায় নি?

না। ওঠ্ এখন, বের হতে হবে। মা ছুটে গিয়ে তরুণটির হাত ধরে টেনে আনলেন। সে একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল, কিন্তু বের হয়ে আসতে আপত্তি করল না। বাইরে বৃষ্টিটা কমেছে, কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি, পিছনে মা তরুণটিকে হাত ধরে আনছেন। একটু উঠে পিছনে তাকালাম, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম, তরুণটি সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর মা তারস্বরে চিৎকার করছেন। আমি ছুটে গিয়ে তরুণটিকে ধরার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অসম্ভব শক্তি এই বিচিত্র তরুণটির। আমাকে প্রায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে হেঁটে গেল। ভয়ংকর একটা ঢেউ ছুটে আসছে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, মুহূর্তে ঢেউটি এই তরুণটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উন্মত্ত সমুদ্রে। কিন্তু একটা খুব বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, ভয়ঙ্কর ঢেউটি হঠাৎ করে ভেঙে গেল তার পায়ের কাছে। পানির ঢল হয়ে নিচে নেমে গেল ঢেউটি।

তরুণটি আরো এগিয়ে যায়, পানির বড় আরেকটা ঢেউ আবার আঘাত করতে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! তরুণটি কেমন করে জানল এটি ঘটবে? কী বিচিত্র আত্মবিশ্বাসে সে এগিয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত সমুদ্রের দিকে,

আর কী সহজে উন্মত্ত সমুদ্র বশ মেনে যাচ্ছে এই তরুণের কাছে!

আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মা আমার পাশে এসে দাঁড়ান। ফিসফিস করে বলেন, কুনিল। দেখেছিস?

কী হচ্ছে এটা মা? সত্যি কি হচ্ছে?

হ্যাঁ বাবা। আমি দেখে বুঝেছিলাম এ সাধারণ মানুষ নয়।

তাহলে কে?

ঈশ্বরের দূত। মা ফিসফিস করে প্রার্থনা শুরু করলেন, 'হে পরম করুণাময় ঈশ্বর। দয়া কর। দয়া কর। দয়া কর।'

আরেকটি ভয়াবহ ঢেউ ছুটে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। তরুণটি ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যায় আর সেই ভয়াবহ জলরাশি আবার পায়ের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তরুণটি মাথা উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে, আর বিশাল জলরাশি মাথা নিচু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। গায়ের সাদা চাদর উড়ছে বাতাসে, মনে হচ্ছে সত্যিই সে নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের আহ্বানে। তার সামনে মাথা নত করে ফেলছে প্রকৃতি, উন্মত্ত সমুদ্র, ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস।

মা আবার ফিসফিস করে বললেন, ঈশ্বর আমাদের দিকে মুখ চেয়ে তাকিয়েছেন। তাঁর দূত পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। দেখ্ কুনিল, তাকিয়ে দেখ্! হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর।

আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু তবু মায়ের কথার সাথে একমত হতে পারলাম না। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, এই পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়, এক জন ঈশ্বর থাকলে তিনি সেটা করতে দিতেন না। আর সেটা যদি করতে দিয়ে থাকেন, হঠাৎ করে একটি জলোচ্ছ্বাস থামিয়ে দেওয়ার জন্যে এক জন উলঙ্গ দূত পাঠিয়ে দেবেন না। আমাদের জন্যে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। বিন্দুমাত্রও নয়।

এই তরুণটি মানসিক ভারসাম্যহীন একটি তরুণ। নির্বোধের মতো সে জলোচ্ছ্বাসের মাঝে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে জলোচ্ছ্বাস সরে গিয়েছে। মানসিক ভারসাম্যহীন এই তরুণ এক জন ভাগ্যবান তরুণ—অসম্ভব ভাগ্যবান এক জন তরুণ। তার বেশি কিছু নয়।

আমি অবাক বিস্ময়ে মানসিক ভারসাম্যহীন এই অস্বাভাবিক ভাগ্যবান তরুণটির দিকে তাকিয়ে থাকি।

৪. রুকাস

আমার মা বেশ খাটাখাটুনি করে তরুণটির জন্যে একটা পোশাক তৈরি করলেন। নীল রঙের একটা ট্রাউজার এবং বেশ কয়েকটি পকেটসহ ঢিলেঢালা একটা কোট। আমার মায়ের নানা ধরনের গুণ রয়েছে, কিন্তু পোশাক তৈরি তার মাঝে একটি নয়। তরুণটি সেটা বুঝতে পেরেছে মনে হল না, কারণ পোশাকটা চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে পরিয়ে দেবার পর প্রথমবার তার মুখে একটি অভিব্যক্তি দেখা গেল। সে আমার মায়ের দিকে

তাকিয়ে একটু হেসে দিল। মা উত্তেজিত হয়ে আমাকে বললেন, দেখলি? দেখলি? কত পছন্দ করল পোশাকটা।

আমি বললাম, তোমার এই পোশাক যদি পছন্দ করে, বুঝতে হবে এর মাথায় বড় ধরনের গোলমাল আছে।

মা একটু রেগে বললেন, বাজে বকিস না। কোথা থেকে এসেছে, কী রকম কাপড় পরে অভ্যাস কে জানে, একটু ঢিলেঢালা কাপড়ই ভালো।

তরুণটির চেহারা অসম্ভব সুন্দর, শুধুমাত্র সে কারণে আমার মায়ের তৈরি একটি বিচিত্র পোশাকেও তাকে চমৎকার মানিয়ে গেল। পোশাক শেষ করে মা এবারে তার খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার সাথে দেখা হয়েছে প্রায় আঠারো ঘন্টা হয়ে গেছে, এই দীর্ঘ সময়ে সে কিছু খায় নি। সময় নিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করে মা আবার তরুণটিকে খাবার জন্যে ডেকে আনলেন। খাবার টেবিলে বসতে গিয়েও তরুণটিকে বেশ কসরত করতে হল বলে মনে হল। তার প্লেটে খাবার তুলে দেয়া হল এবং আমরা নানাভাবে তাকে খাবার মুখে দিতে ইশারা করতে থাকি, কিন্তু সে খাবার মুখে দিল না। আমি মাকে বললাম, মা, তোমার কথাই ঠিক। এ আসলেই ঈশ্বরের দূত। এ জন্যে কিছু খেতে হয় না। বাতাস খেয়ে থাকে।

মা আবার আমার উপর রেগে গেলেন, বললেন, বাজে বকিস না। কী খায়, কী খেয়ে অভ্যাস কে জানে, একটা কিছু দিলেই কি খেতে পারবে?

মা'কে খুশি করানোর জন্যেই কি না জানি না, তরুণটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এক টুকরা মাংস তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে খুব সাবধানে একটু কামড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবুতে থাকে। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই খাবারটি তার পছন্দ হয়েছে কি না। আমরা যতক্ষণে আমাদের খাবার শেষ করলাম তরুণটি ততক্ষণ ঐ মাংসের টুকরাটি নিয়ে বসে রইল। ছোট শিশু যেরকম বড় একটি মিষ্টি হাতে নিয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে চুষে খেতে থাকে, তরুণটির খাওয়ার ধরনটি অনেকটা সেরকম।

খেতে খেতে মা তরুণটির সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম কুনিল। কু–নি–ল।

তারপর তরুণটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তোমার নাম কি?

উত্তরে তরুণটি মধুরভাবে হাসল। মধুর হাসি নিশ্চয়ই কারো নাম হতে পারে না। মা আবার চেষ্টা করলেন, আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম কু–নি–ল। তারপর নিজেকে দেখিয়ে বললেন, আমার নাম লানা। আমি কুনিলের মা। তোমার নাম কি?

তরুণটি উত্তরে কিছু না বলে আবার মধুরভাবে একটু হেসে দিল।

আমি বললাম, এর নাম হচ্ছে মধুর হাসি—দেখছ না কেমন মধুরভাবে হাসছে!

মা বললেন, বাজে কথা বলবি না।

বোকা–হাসিও বলতে পার! বোকার মতো হাসি।

চুপ কর্।

সংক্ষেপে বুকাস! বুকাস নামটা খারাপ না। কি বল।

ফাজলেমি করবি না।

ঠিক আছে, তাহলে রুকাস! আমি তরুণটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার

নাম রুকাস।

তরুণটি প্রথমবার কথা বলল, আস্তে আস্তে বলল, রুকাস। এক জন মানুষের গলার স্বর এত সুন্দর হতে পারে, আমি নিজের কানে না শুনলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। আমি নিজেকে দেখিয়ে বললাম, আমার নাম কুনিল।

তরুণটি আবার আস্তে আস্তে বলল, কুনিল।

আমি তরুণটিকে দেখিয়ে বললাম, তোমার নাম—রুকাস।

রুকাস।

নামটি নিশ্চয়ই তার পছন্দ হয়েছে, কারণ বেশ আপন মনে কয়েকবার বলল, রুকাস। রু--কাস। রু–কা–স। রুকাস।

মা উষ্ণ স্বরে বললেন, কেন ছেলেটিকে জ্বালাতন করছিস?

কিসের জ্বালাতন? নাম ছিল না, তাই নাম দিয়ে দিলাম।

মা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন।

বিকেলবেলা আমি তরুণটিকে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। কিরীণার বাসার পাশে দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখে কিরীণা ছুটে এল। তরুণটিকে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, এত সুন্দর চেহারা তরুণটির, কিরীণা যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বিচিত্র কি? আমি আমার বুকে ঈর্ষার একটা সূক্ষ্ম খোঁচা বোধ করতে থাকি।

কিরীণা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এ কে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, কেউ জানে না এ কে।

কোথা থেকে এসেছে?

কেউ জানে না।

তাহলে কেমন করে এল?

সেটাও কেউ জানে না।

কিরীণা আমার বুকে একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে বলল, ছাই ঠিক করে বল না কী হয়েছে? আমি তখন কিরীণাকে সবকিছু খুলে বললাম। গভীর রাতে তার সামনে সমুদ্রের ঢেউ কেমন করে পিছিয়ে যাচ্ছিল শুনে কিরীণার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গল্প শেষ করে আমি গলা নামিয়ে বললাম, মা মনে করে এ হচ্ছে ঈশ্বরের দূত।

কিরীণা বুকে হাত দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দূত। নিশ্চয়ই।

ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কথা বললে বড়রা যেরকম করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকায়, আমি ঠিক সেভাবে কিরীণার দিকে তাকালাম। কিরীণা আবার রাগ হয়ে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস কর না বলে অন্যেরাও বিশ্বাস করতে পারবে না?

আমি আর কোনো প্রতিবাদ করলাম না। কিরীণার অনেক অর্থহীন কথাবার্তা আমি সহ্য করি।

এখন তোমরা কোথায় যাও?

ইলির কাছে।

কেন?

দেখি ইলি কিছু বলতে পারে কি না। তুমি যাবে আমার সাথে?

কিরীণা একটু ইতস্তত করে রাজি হল।

তরুণটিকে দেখে ইলি খুব অবাক হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইলি, এ কি ট্রন?

মনে হয় না। এর চেহারা ট্রনদের মতো নয়।

তাহলে এ কে? কোথা থেকে এসেছে?

সেটা তো আমি জানি না। ইলি খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার কাছে নূতন একটা যন্ত্র এসেছে, সেটা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারি।

কি যন্ত্র?

মানুষের জিন্‌স্‌ বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে বলে দেয়। কোন জাতি, কোন দেশের মানুষ, কোথায় অবস্থান এইসব।

কেমন করে কাজ করে এটা?

এক ফোঁটা রক্ত দিতে হয়। দেখি, তোমারটা দিয়ে শুরু করি।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, একটি জটিল যন্ত্র থেকে একটা ছোট নল বের হয়ে এসেছে, তার মাথায় একটা সুচের মতন কী যেন। আঙুলটিতে সেটা দিয়ে ছোট একটা খোঁচা দিতেই লাল এক ফোঁটা রক্ত বের হয়ে আসে, সাথে সাথে ঘড়ঘড় করে যন্ত্রটার মাঝে শব্দ হতে থাকে, রক্তের ফোঁটাটি যন্ত্রের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। সামনে স্ক্রিনে অসংখ্য সংখ্যা বের হয়ে আসে। ইলি ভুরু কুঁচকে সংখ্যাগুলো দেখে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখছ ইলি?

তোমার সম্পর্কে সবকিছু লিখে দিচ্ছে!

কিরীণা জিজ্ঞেস করল, কী লিখেছে?

এশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষ। বয়স তেরো—

তেরো! আমি খুব অবাক হবার ভান করে বললাম, হতেই পারে না। আমি কমপক্ষে পনেরো।

ইলি চোখ মটকে বলতে শুরু করল, রক্তের গ্রুপ জিটা চৌদ্দ দশমিক চার, জিনেটিক কোড আলফা রো তিন তিন চার পাঁচ নয়—

এগুলোর মানে কি?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমিও ঠিক জানি না। তবে তুমি কোন এলাকা থেকে এসেছ সেটাও বলে দেবার কথা!

খানিকক্ষণ স্ক্রিনটা দেখে ইলি মাথা নাড়ল, তোমার পূর্বপুরুষেরা এসেছে ভারত মহাসাগরের ছোট একটা দ্বীপ থেকে। দ্বীপের অক্ষাংশ সাত দ্রাঘিমাংশ।

কিরীণা বলল, এবার আমারটা বের কর।

এক ফোঁটা রক্ত দিতে হবে কিন্তু।

ব্যথা করবে না তো?

না, ব্যথা করবে না।

কিরীণার রক্ত পরীক্ষা করেও বিশেষ নূতন কিছু জানা গেল না। সে মেয়ে, তার বয়স চৌদ্দ এ দু'টি তথ্য জানার জন্যে এরকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তার পূর্বপুরুষেরা এসেছে উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে।

আমার আর কিরীণার রক্ত পরীক্ষা করে বোঝা গেল এই প্রাচীন এবং নড়বড়ে

যন্ত্রটি মোটামুটিভাবে কাজ করে। এবারে তরুণটির রক্ত পরীক্ষা করার কথা। আমি তরুণটিকে ইঙ্গিত করলাম তার হাতটা টেবিলের উপর রাখার জন্যে। সে আপত্তি না করেই হাতটি এগিয়ে দিল। তরুণটির মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি, ছোট শিশুদের অর্থহীন আব্দার শোনার সময় বড়রা যেরকম মুখভঙ্গি করে, অনেকটা সেরকম।

তার আঙুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে যন্ত্রটি অনেকক্ষণ নানারকম বিদঘুটে শব্দ করে একসময় স্ক্রিনে অসংখ্য লেখা শুরু হতে থাকে। ইলি ভুরু কুঁচকে সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল ইলি?

কিছু–একটা গোলমাল হয়েছে। ঠিক করে কাজ করে নি যন্ত্রটা।

কেন?

লিখেছে এশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষ। আদি বাসস্থান দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, রক্তের গ্রুপ কাপ্‌পা তেরো দশমিক নয়। জিনেটিক কোডটাও দিয়েছে কিছু–একটা। কিন্তু বয়সটা গোলমাল করে ফেলেছে।

কি গোলমাল?

ইলি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, বয়স লিখেছে দুই হাজার তিন শ’ নয়।

কিরীণা হি হি করে হেসে বলল, এর বয়স দুই হাজার?

দুই হাজার তিন শ’ নয়।

তোমার যন্ত্র এই সহজ জিনিসটাও জানে না যে এক জন মানুষের বয়স দুই হাজার তিন শ’ নয় হতে পারে না?

জানা উচিত ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, বয়সটা নেগেটিভ দুই হাজার তিন শ’ নয়। সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন রয়েছে।

এবারে আমি আর কিরীণা দু’জনেই জোরে হেসে উঠলাম। শুধু যে বয়স দুই হাজারের বেশি সেটাই নয়, বয়সটা আরো উল্টোদিকে!

ইলি স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এর আগে কখনো যন্ত্রটা ভুল করে নি। এখন কেন করল?

আমি তরুণটির দিকে তাকালাম, মুখে মৃদু একটা হাসি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠি, হঠাৎ করে আমার মাথায় খুব বিচিত্র একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দেয়। আমি ইলির দিকে তাকিয়ে বললাম, ইলি—

কি?

এটা কি হতে পারে যে এই তরুণটি—

এই তরুণটি কি?

আমি মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। ঘুরে তরুণটির দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখে সেই মৃদু হাসিটি নেই, তার বদলে কেমন যেন গভীর বিষাদের ছাপ। সে কি বুঝতে পেরেছে আমি কী ভাবছি?

কিরীণা জিজ্ঞেস করল, এই তরুণটি কি?

না, কিছু না। আমি কথা ঘোরানোর জন্যে বললাম, তার সাথে কি কোনোভাবে কথা বলা যায় না?

কিরীণা বলল, আমি দেখি চেষ্টা করে। সে তরুণটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

তরুণটি হাসিমুখে কিরীণার দিকে তাকিয়ে রইল দেখে কিরীণা এবারে গলা উঁচিয়ে বলল, তোমার নাম কি—যেন জোরে কথা বললেই ভাষার ব্যবধান ভেঙে পড়ে! কিরীণার কাজকর্ম মাঝে মাঝে এত ছেলেমানুষি যে সেটি বলার নয়।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তরুণটি হঠাৎ তার সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরে বলল, রুকাস!

কিরীণা চিৎকার করে বলল, এই তো কথা বলছে!

আমি কিছু বলার আগেই তরুণটি আবার ফিসফিস করে অনুচ্চ স্বরে বলল, নাম রুকাস আমার।

আমি একটু অবাক হয়ে রুকাসের দিকে তাকিয়ে দেখি! সত্যি তাহলে সে কথা বলার চেষ্টা করছে। উচ্চারণ ভঙ্গিটি কি বিচিত্র, প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা করে বলছে, কথা বলার সময় ঠোঁট দু'টি মনে হয় নড়ছেই না! কথাগুলো মনে হয় আসছে গলার ভেতর থেকে।

ইলির বাসা থেকে সে রাতে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম তখন সেই বিচিত্র তরুণটি বেশ কিছু কথা শিখে গিয়েছে। তরুণটির স্মৃতি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। একটি কথা একবার শুনলেই সেটি প্রায় নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারে।

দু' মাস পরের কথা। রুকাস এতদিনে বেশ কথা বলা শিখে গেছে। আমি আমার ক্রিস্টাল রিডারের একটি অংশে বৈদ্যুতিক চাপ পরীক্ষা করতে করতে তার সাথে কথা বলছিলাম, কথাবার্তায় ঘুরেফিরে আমি সবসময়েই তার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানতে চাই, যেটা সে সযত্নে এড়িয়ে যায়। আমি সম্ভবত সহস্রতম বার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে রুকাস?

আমি রুকাস।

সেটা তো জানি, কিন্তু তুমি আসলে কে?

আমি আসলে রুকাস।

তোমার কি ভাই আছে?

তুমি আমার ভাই।

তোমার কি সত্যিকার ভাই আছে? সত্যিকার বোন? মা-বাবা? আছে?

রুকাস চুপ করে থেকে অল্প একটু হাসে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তুমি আমাদের কাছে কেন এসেছ?

রুকাস কোনো উত্তর দেয় না। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তুমি কি আবার চলে যাবে?

রুকাসের মুখ তখন হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি একদিন সে যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করে চলে যাবে।

আমার কেমন জানি একটু মন-খারাপ হয়ে যায়।

কয়দিন থেকে চারদিকে একটা চাপা ভয়। খবর এসেছে মধ্য অঞ্চলে ট্রনেরা হানা দিয়েছে। এবারে শিশু নয়, অসংখ্য কিশোর-কিশোরীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তারা যদি আবার আমাদের এখানে আসে? সাধারণত এক জায়গায় তারা এত অল্প

সময়ের মাঝে দ্বিতীয় বার আসে না, কিন্তু এসব ব্যাপারে কেউ কি তার সত্যিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

ভেবেছিলাম আমাদের চাপা অশান্তি রুকাসকে স্পর্শ করবে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করল না। আমরা যখন বিষণ্ণ গলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতাম, ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম, রুকাস সেগুলি কৌতূহল নিয়ে শুনত, কিন্তু কখনোই কোনো প্রশ্ন করত না। মাঝে মাঝে রুকাসকে দেখে মনে হত সে বুঝি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। যে ভয়ংকর বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এবং ঘটনাক্রমে সে নিজেও যে এই বিপদের অংশ হয়ে গেছে, ব্যাপারটি যেন সে কখনো অনুভব করতে পারে নি।

তাই দু' সপ্তাহ পর যখন ভোররাতে আবার সেই ভয়াবহ শঙ্খধ্বনির মতো সাইরেন বেজে উঠল, রুকাসকে এতটুকু বিচলিত হতে দেখা গেল না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের শব্দ?

ট্রনেরা আসছে।

ও।

রুকাস বিছানা থেকে ওঠার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না। বিছানায় আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। আমি তাকে ডাকলাম, রুকাস।

কি?

এখন আমাদের সবাইকে সমুদ্রতীরে যেতে হবে।

ও। রুকাস কোনো আপত্তি না করে বিছানা থেকে ওঠে, আমাকে বলল, চল যাই।

আমার মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুকাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখে ভয় বা আতঙ্কের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, ব্যাপারটি আমার মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, দেখেছিস কুনিল? দেখেছিস? একটুও ভয় নেই মুখে।

দেখেছি মা।

কেন ভয় নেই? কেন?

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। ছোট বাচ্চারা দেখ নি আগুনকে ধরতে যায়? সেরকম।

না না। মা মাথা নাড়লেন, রুকাস কিছু-একটা জানে, যেটা আমরা জানি না।

আমি রুকাসের দিকে তাকালাম, তার শান্তপ্রায় নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল রুকাস সত্যিই কিছু-একটা জানে, যেটা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত জ্ঞানটুকু যখন আমরা জানব, তখন আমাদেরও কোনো ভয়ভীতি থাকবে না। রুকাসের মতো শান্তমুখে সমুদ্রতীরে বালুবেলায় ট্রনদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারব।

ট্রনদের আক্রমণটুকু হল বড় নৃশংস। বড় বড় ছয়টি মহাকাশযানের মতো দেখতে একধরনের প্লেন নামল বালুবেলায়। ভেতর থেকে ছোট ছোট একধরনের রবোট নেমে এল প্রথমে—ছুটে গিয়ে সবাইকে ঘিরে ফেলল প্রথমে। ট্রনেরা নামল তারপর। গতবারের মতো হাসিখুশি নয়, চেহারায় ক্লান্তি এবং একধরনের বিতৃষ্ণা। দেহরক্ষী রবোটদের নিয়ে আমাদের কাছে হেঁটে আসতে থাকে ট্রন পুরুষ এবং মহিলারা। বারো থেকে

পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরীদের দেখিয়ে দিতে থাকে আঙুল দিয়ে। সাথে সাথে দেহরক্ষী রবোটগুলো হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয় নিজেদের ঘাড়ে। করুণ কান্নায় পুরো বালুবেলা আর্তনাদ করে ওঠে সাথে সাথে।

অত্যন্ত নৃশংসভাবে কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটাল ট্রন পুরুষ এবং মহিলারা, কান্নার শব্দ তাদের ভালো লাগে না—যারাই এতটুকু শব্দ করেছে; সাথে সাথে তাদের হত্যা করেছে আশ্চর্য নির্লিপ্ততায়।

আমি আর কিরীণা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিরীণা ফিসফিস করে বলল, কুনিল।

কি?

আমি যদি আজ মরে যাই—

অশুভ কথা মুখে আনতে নেই।

যদি মরে যাই, কিরীণা বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, তাহলে কোনোদিন তোমাকে বলার সুযোগ পাব না।

কী বলার সুযোগ পাবে না?

আমি তোমাকে—

কিরীণার কথা মুখে থেমে যায়, এক জন ট্রন মেয়ে লম্বা পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি তার চোখে চোখ না ফেলতে, কিন্তু মেয়েটি খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে কুলাককে, তারপর নিশ, তারপর কিরীণার দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘুরে চলে গেল। দেহরক্ষী রবোট সাথে সাথে তিনজনকে ধরে উপরে তুলে নেয়। কিরীণা রক্তহীন মুখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত একবার বাড়িয়ে দিল আমার দিকে—যেন আমাকে একবার স্পর্শ করতে চায় শেষবারের মতো। চিৎকার করে পৃথিবী বিদীর্ণ করে দিতে চাইলাম আমি, পারলাম না, আমার মা ঝাপটে আমার মুখ চেপে ধরেছেন পিছন থেকে। ফিসফিস করে বলছেন, হে ঈশ্বর, করুণা কর। করুণা কর। করুণা কর।

রুকাস শান্ত চোখে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে যেন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু এটা তো করতে পারে না।

কেউ কোনো কথা বলল না, রুকাস সবার দিকে তাকাল, তারপর দুই পা সামনে এগিয়ে উচ্চস্বরে বলল, এটা তো করতে পার না তোমরা। ছেড়ে দাও সবাইকে, ছেড়ে দাও—

ট্রন মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, রুকাসকে দেখে হকচকিয়ে গেল। হঠাৎ গুলি করার জন্যে হাতের অস্ত্রটি তুলেও থেমে গেল মেয়েটি। এত রূপবান একটি মানুষকে হত্যা করা সহজ নয়—বিশেষ করে একটা মেয়ের জন্যে।

ট্রন ভাষায় কী একটা বলল রুকাসকে। রুকাস মাথা নেড়ে বলল, ছেড়ে দাও সবাইকে। কাউকে নিতে পারবে না। কাউকে নিতে পারবে না।

ট্রন মেয়েটির মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে ওঠে, খানিকটা অবজ্ঞা, খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা অন্ধ ক্রোধ। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে গুলি করল রুকাসকে। ছোট শিশুরা নোংরা হাতে বড়দের ছোঁয়ার সময় বড়রা আলগোছে সরে গিয়ে যেভাবে নিজেকে রক্ষা করে, অনেকটা সেভাবে রুকাস সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করল, বলল,

ছেড়ে দাও সবাইকে।

ট্রন মেয়েটি অবাক হয়ে একবার রুকাসকে, আরেকবার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির দিকে তাকাতে লাগল। কোনো মানুষ এই অস্ত্রটি থেকে এত সহজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সেটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেয়েটি আবার অস্ত্রটি তুলে ধরে—রুকাস তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আমাদের দিকে ঘুরে তাকায়, অনেকটা ব্যথাতুর গলায় বলে, ওরা আমার কথা শুনছে না।

আমি চিৎকার করে বললাম, সাবধান।

ট্রন মেয়েটি গুলি করল এবং আবার রুকাস সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করল। মেয়েটিকে বলল, তুমি আমাকে মারতে পারবে না। আর চেষ্টা কোরো না। ঠিক আছে?

মেয়েটা অবাক হয়ে রুকাসের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই বিস্ময়ের সাথে সাথে হঠাৎ আতঙ্কের একটা চিহ্ন পড়ছে তার মুখে।

রুকাস কিছুক্ষণ চারদিকে তাকাল। তারপর অনেকটা হাল ছেড়ে দেয়ার মতো করে মাথা নাড়ল। চারদিক থেকে ট্রনেরা ছুটে আসছে রুকাসের দিকে, সবাই বুঝতে পেরেছে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে এখানে।

এরপর রুকাস যেটি করল আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সে নিজের হাতটা মুখের কাছে তুলে কনুইয়ের কাছে কামড়ে ধরে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিল, একঝলক রক্ত বের হয়ে তার মুখ, দাঁত, বুকের কাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। রুকাস ভ্রূক্ষেপ করল না, রক্তাক্ত অংশটি স্পর্শ করে চামড়ার নিচে থেকে চকচকে ছোট একটা জিনিস বের করে আনল। রুকাস তার শরীরে এই জিনিসটি লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

জিনিসটি কী আমরা জানি না। এটা দিয়ে কী করা হয় তাও আমরা জানি না। রুকাস সেই ছোট ধাতব জিনিসটা হাতে নিয়ে মহাকাশযানের মতো দেখতে বিশাল প্লেনটির দিকে লক্ষ করে কোথায় যেন টিপে দেয়, সাথে সাথে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে পুরো মহাকাশযানটি চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে গেল। জ্বলন্ত আগুনের বিশাল একটা গোলক সবাইকে আগুনের হলকার স্পর্শ দিয়ে উপরে উঠে গেল।

আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ট্রনেরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রুকাস হাতের ছোট ধাতব জিনিসটা দ্বিতীয় মহাকাশযানের দিকে লক্ষ করে মুহূর্তে সেটিকে ধ্বংস করে দিল। তারপর তৃতীয়টি।

রুকাস এবারে ট্রনদের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে এখানে ছেড়ে দিয়ে তোমরা যাও। এক্ষুনি যাও।

ট্রনেরা তার কথা বুঝতে পারল না সত্যি, কিন্তু সে কি বলতে চাইছে বুঝতে তাদের কোনো অসুবিধে হল না। হঠাৎ করে প্রাণভয়ে সবাই ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে তারা পিছনে তাকায়, তারপর আবার ছুটতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, উঠে গিয়ে আবার ছুটতে থাকে। এক জনের মাথার উপর দিয়ে আরেকজন ছুটতে থাকে। এক জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আরেকজন ছুটতে থাকে। হাতের অস্ত্র ফেলে তারা ছুটতে থাকে। দেহরক্ষী রবোট, অনুসন্ধানকারী রবোটকে পিছনে ফেলে তারা ছুটতে থাকে।

ছাড়া পেয়ে কিশোর-কিশোরীরা বুঝতে পারছে না কী করবে। বিহ্বলের মতো ইতস্তত এদিকে-সেদিকে তাকাতে থাকে তারা, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসতে থাকে

আমাদের দিকে।

কিরীণাকে দেখতে পাই আমি, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে সে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে বালুতে, কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে আসছে। আমি ছুটে গিয়ে কিরীণাকে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম, কিরীণা, কিরীণা, সোনা আমার—

কিরীণা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বলেছিলাম না আমি, বলেছিলাম না?

কি বলেছিলে?

রুকাস হচ্ছে ঈশ্বরের দূত। দেখলে, কী ভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে ট্রনদের? আমাদের রক্ষা করতে এসেছে। বলেছিলাম না আমি।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। কিরীণাকে শক্ত করে ধরে রাখলাম, দেখলাম, ট্রনদের মহাকাশযানগুলো একটা একটা করে আকাশে উঠে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শুধু মানুষগুলো পালিয়ে গেছে, পিছনে ফেলে গেছে অসংখ্য রবোট। সেগুলো এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। তাদের কপেট্রনের ভেতর এখন নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব! বুদ্ধির বাইরে কিছু-একটা সমস্যার মুখোমুখী হলে রবোটদের মতো অসহায় আর কিছু নয়।

কিরীণাকে ছেড়ে আমি এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। রুকাস স্থির হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, ডান হাতে সেই আশ্চর্য ধাতব জিনিসটি, যেটি এখনো আলগোছে ধরে রেখেছে। হাতের কনুইয়ের কাছে ক্ষতটি থেকে এখনো রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। অসংখ্য মানুষ ভিড় করে এসেছে রুকাসের কাছে। মাথা নিচু করে এসে বসছে তার কাছে।

আমি কিরীণার হাত ধরে মানুষের ভিড় ঠেলে রুকাসের কাছে যেতে চেষ্টা করি। আমাদের পথ ছেড়ে দিল অনেকে, সবাই জানে রুকাস আমার বাসার অতিথি।

কাছে গিয়ে আমি রুকাসের হাত স্পর্শ করে বললাম, রুকাস।

রুকাস ঘুরে আমার দিকে তাকাল। বলল, কী কুনিল?

আমি কিছু বলার আগেই কিরীণা বলল, তুমি না থাকলে আজ আমার কী হত? কী হত রুকাস? বলতে বলতে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

রুকাস একটু অবাক হয়ে কিরীণার দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিতভাবে তার মাথায় হাত রেখে বলল, কাঁদে না কিরীণা। কেউ কাঁদলে কী করতে হয় আমি জানি না।

ভিড় ঠেলে ইলিও এগিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, রুকাস, তুমি কেমন করে সবকিছু ধ্বংস করে দিলে, কী ছিল তোমার হাতে?

আমি বললাম, আমি বলব?

বল।

আমি রুকাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, তুমি ভবিষ্যতের মানুষ। তুমি দুই হাজার থেকেও বেশি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছ। তাই না?

রুকাস আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

তাই তোমার আছে ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র। যেটা দিয়ে তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ সবকিছু।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে রুকাসের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, সেজন্যে ইলির যন্ত্রে তোমার বয়স এসেছে নেগেটিভ দুই হাজার তিন শ' নয়। কারণ

তুমি সময়ের উল্টোদিকে এসেছ। রুকাস আবার মাথা নাড়ল।

তুমি কেন এসেছ রুকাস, আমাদের কাছে? রুকাস বিষণ্ন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার উপর ভয়ানক বিপদ, তাই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লুকিয়ে আছি অজ্ঞাত সময়ে।

তুমি লুকিয়ে আছ?

হ্যাঁ। আমি লুকিয়ে ছিলাম। এখন আর লুকিয়ে নেই। এখন জানাজানি হয়ে গেল। এখন তারা জেনে যাবে।

কারা?

যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের নাম বায়োবট। সব জায়গায় তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আমাকে।

৫. বায়োবট

আমার মা রুকাসের কনুইয়ে একটা ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। এক জন মানুষ যে নিজের শরীরের ভেতরে করে এরকম ভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে সেটি কে জানত। ব্যান্ডেজটি লাগাতে লাগাতে বললেন, তোমার শরীরের ভেতরে কি আর কিছু রয়েছে?

না। আর কিছুর প্রয়োজনও নেই।

কেন?

রুকাস টেবিলের উপর রাখা ছোট ধাতব অস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই অস্ত্রটি শুধু আমিই ব্যবহার করতে পারব, পৃথিবীর আর কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে না। এটা শুধু অস্ত্র নয়, এটা আমার যোগাযোগের যন্ত্র। এটা দিয়ে আমি আমার মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

তোমার কোন মানুষ?

আমি যে সময় থেকে এসেছি, সেই সময়ের মানুষ।

তুমি যোগাযোগ করেছ?

এখনো করি নি। অস্ত্রটা যখন ব্যবহার করেছি তখন অবশ্যি নিজে থেকে যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমার যারা বন্ধু তাদের সাথে, যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের সাথেও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

রুকাস হাতের ব্যান্ডেজটা একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, সেটা অনেক বড় একটা গল্প।

বলবে আমাদের সেই গল্প?

শুনতে চাও? ভালো লাগবে না শুনে।

তবু শুনব।

রুকাস যে গল্পটি বলল, সেটি খুব বিচিত্র। কেন জানি না আমার ধারণা ছিল যত

দিন যাবে, মানব সভ্যতার তত উন্নতি হবে। কিন্তু মানব সভ্যতার যে সময়ের সাথে সাথে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, সেটি আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল একটা দুর্ঘটনার মাঝে দিয়ে। একটি শিশু একটা খারাপ দুর্ঘটনায় দুই হাত-পা-ই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসাসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং তখন বেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কাজেই শিশুটিকে কৃত্রিম হাত এবং পা লাগিয়ে দেয়া হল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার হাত এবং পা সাধারণ মানুষের হাত এবং পায়ের থেকে অনেক বেশি কার্যকর, অনেক বেশি শক্তিশালী।

ব্যাপারটির শুরু এভাবে। ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আকারের শক্তিশালী কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে, কৃত্রিম হাত এবং পায়ের মাঝে অসংখ্য কম্পিউটার জটিল কাজকর্ম করতে পারে। সাধারণ মানুষ তার হাত দিয়ে যে কাজ করতে পারে না, কৃত্রিম হাতের মানুষ তার থেকে অনেক নিখুঁত কাজ করতে পারে।

তখন জটিল কাজকর্ম করার জন্যে কিছু মানুষ ইচ্ছে করে নিজের হাত কেটে সেখানে যান্ত্রিক হাত লাগিয়ে নেয়া শুরু করল। প্রথম প্রথম সেটা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কিছুদিনেই সাধারণ মানুষজন ব্যাপারটিকে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করা শুরু করে দিল।

কৃত্রিম হাত-পা তৈরির কলকারখানাগুলো তখন সাধারণ মানুষজনকে তাদের সত্যিকার হাত-পা পাল্টে অনেক ক্ষমতাশালী যান্ত্রিক হাত-পা ব্যবহার করার জন্যে উৎসাহিত করতে শুরু করে দিল। কিছুদিনের মাঝেই দেখা গেল বিপুল জনগোষ্ঠী তাদের কথা শুনে কৃত্রিম হাত-পা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তারা সাধারণ মানুষ থেকে বেশি কার্যক্ষম, এধরনের একটা কথা নানা জায়গায় শোনা যেতে লাগল। কৃত্রিম হাত-পা তৈরির কলকারখানা তখন বিশাল আকার নিয়েছে, তারা একসময় ব্যাপারটিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করতে শুরু করে। ছোট শিশুর জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তার স্বাভাবিক হাত-পা কেটে সেখানে যান্ত্রিক হাত-পা লাগিয়ে দেয়ার একটা প্রবণতা খুব ধীরে ধীরে মানুষজনের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল মানুষ এবং তাদের রবোটের মতো হাত-পা, দুই মিলে তাদের বায়োলজিক্যাল রবোট বা সংক্ষেপে বায়োবট বলা শুরু করা হল।

এর পরের কয়েক শতাব্দী মূলতঃ বায়োবটগোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষদের মাঝে একটা প্রতিযোগিতায় কেটে গেল। পৃথিবীর মূল অর্থনীতি রবোটিক শিল্পভিত্তিক। এই শিল্পগুলো নানাভাবে পৃথিবীর মাঝে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করায় বায়োবটদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল।

নানা ধরনের গবেষণা শুরু হল তখন। মায়েরা সন্তানদের পেটে ধরামাত্রই তাদের নানারকম ঔষধপত্র খাওয়ানো শুরু করিয়ে দেয়া হত, যে কারণে শিশুরা জন্ম নিল বিকলাঙ্গ অবস্থায়। তাদের বায়োবট তৈরি না করে কোনো উপায় ছিল না। খুব ধীরে ধীরে বায়োবটের মাঝে মস্তিষ্ক এবং প্রজননের অঙ্গ ছাড়া প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃত্রিম কোনো যন্ত্র দিয়ে পাল্টে দেয়া হল। মানুষের চিন্তা এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতার সাথে যন্ত্রের নিখুঁত কাজ করার ক্ষমতা যোগ করে এক ধরনের বিচিত্র প্রাণীর সৃষ্টি হল তখন। তাদের সংবেদনশীল ফটো সেলের চোখ আলট্রা ভায়োলেট থেকে শুরু করে

ইনফ্রায়েড পর্যন্ত দেখতে পায়। চোখ ইচ্ছেমতো অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ক্ষমতায় পারদর্শী হতে পারে। তাদের ইলেকট্রনিক শ্রবণযন্ত্র কয়েক হার্টজ থেকে মেগা হার্টজ পর্যন্ত শুনতে পারে। তাদের ঘ্রাণশক্তি শ্বাপদের ঘ্রাণশক্তিকে হার মানিয়ে দিতে থাকে।

তাদের বুকের ভেতর ছোট দুর্বল ফুসফুসকে জুড়ে দেয়া হয় স্বয়ংক্রিয় ফুসফুসের সাথে। পৃথিবীর দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করে সেই ফুসফুস রক্তের সাথে বিশুদ্ধ অক্সিজেন মিশিয়ে দেয়। কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত মস্তিষ্ক এবং প্রজনন যন্ত্রে পাঠাতে থাকে। সেকেন্ডে দশবার করে হৃৎপিণ্ড বুকের মাঝে ধুকপুক করতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক দেয়ালে অসংখ্য সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক সেন্সর প্রতি মুহূর্তে শরীরের পরিবর্তন মনিটর করতে থাকে। রক্ত পরিশোধন করা হয় যন্ত্র দিয়ে, শরীরের বাইরে। অব্যবহৃত কিডনি, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় সরিয়ে ফেলা হয় জন্মমুহূর্তে, শরীরের আকার হয় ক্ষুদ্র, বিশাল বায়োবটের দেহের মাঝে জুড়ে দেয়া হয় সেই ক্ষুদ্র অপুষ্ট বিকৃত দেহ।

বায়োবটের ক্ষুধা–তৃষ্ণা নেই। পরিপাকযন্ত্রের জায়গা শরীরের নানা অংশে টিউব দিয়ে আসতে থাকে পুষ্টিকর তরল। পরিপাকযন্ত্র নেই বলে মলমূত্র নেই। মানুষকে এরা প্রথমবার মুক্ত করেছে দৈনন্দিন জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে, যদিও সেই ভয়াবহ প্রাণীটিকে সম্ভবত মানুষ আখ্যা দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আর নেই।

জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে মস্তিষ্ককে বিকশিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বেশি, নিউরনের সংখ্যা বেশি বলে তাদের স্মরণশক্তি অচিন্তনীয়। দৈহিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করা হয়েছে মস্তিষ্ককে, দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই মস্তিষ্ককে। দীর্ঘায়ু হয়েছে এই বায়োবট সম্প্রদায়।

বংশবৃদ্ধির জন্যে অবিকৃত রাখা হয়েছে প্রজননযন্ত্রকে। যদিও সন্তানকে আর মায়ের গর্ভে বড় হতে হয় না। ভ্রূণকে বের করে আনা হয় জরায়ু থেকে, কৃত্রিম যন্ত্রে বড় হয় ভ্রূণ। প্রসববেদনার ভিতর দিয়ে যেতে হয় না কোনো বায়োবট রমণীকে, যন্ত্র খুলে বের করে আনা হয় সেই ভ্রূণ।

বিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে এই বায়োবট শ্রেণীকে নিয়ে। পৃথিবীর অর্থনীতি এই বায়োবট শিল্পকে ঘিরে। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণে এই বায়োবট শ্রেণী।

মানুষের ছোট একটি দল বায়োবট হতে রাজি হল না। যন্ত্রের খাঁচায় অতিকায় মস্তিষ্ক এবং প্রজননযন্ত্রকে জুড়ে দিয়ে যান্ত্রিক সাবলীলতায় বাধা পড়ে যাওয়াকে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ মনে করল। সেই অল্পসংখ্যক মানুষকে বায়োবট শ্রেণী উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো একটি কারণে হঠাৎ করে বায়োবট শ্রেণী সিদ্ধান্ত নিল পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষ কেউ থাকতে পারবে না। সবাইকে বায়োবট হয়ে যেতে হবে। মানুষের সাথে তখন বায়োবটের সংঘর্ষের সূত্রপাত। সেই ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পর।

বায়োবটরা তখন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, সমস্ত পৃথিবী মোটামুটিভাবে তাদের হাতের মুঠোয়। মানুষের জন্যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এল হঠাৎ। খুব ধীরে ধীরে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বায়োবটদের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু সামনে রয়েছে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কে জয়ী হবে এখনো কেউ জানে না।

রুকাসকে এই সময় আমি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন বলছ কেউ জানে

না? তুমি তো সময়ের উল্টোদিকে অতীতে চলে এসেছ, তেমনি ভবিষ্যতে চলে গিয়ে দেখে এস।

রুকাস একটু হেসে বলল, সময় পরিভ্রমণের একটা সূত্র আছে। অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো। তুমি শুধুমাত্র সেই সময়েই যেতে পারবে, যেই সময়ের ঘটনাবলীর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

মানে?

মনে কর তুমি সময়ে পরিভ্রমণ করে দশ বছর অতীতে গেলে। সেখানে তুমি দেখতে পেলে তোমাকে, ছোট শিশু। তাকে যদি তুমি হত্যা কর তাহলে তুমি কেমন করে আসবে? কাজেই সময় পরিভ্রমণের সূত্র বলে তুমি দশ বছর অতীতে যেতে পারবে না। তুমি দুই হাজার বছর অতীতে যেতে পারবে। কারণ সেখানে তুমি তোমার পূর্বপুরুষকে সম্ভবত খুঁজে পাবে না। তার সম্ভাবনা খুব কম। প্রকৃতির সূত্র সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করে। যে জিনিসটির সম্ভাবনা কম সেটি সূত্রকে লঙ্ঘন করে না।

কিন্তু সত্যি যদি পেয়ে যাই?

পেয়ে গেলেও তুমি তাকে মারতে পারবে না।

মা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, জ্ঞানের কচকচিটা একটু বন্ধ কর্ দেখি, আমি আগে ইতিহাসটা শুনি।

যেটা এখনো হয় নি, ভবিষ্যতে হবে, সেটা ইতিহাস হয় কেমন করে?

চুপ কর্ তুই।

একটু হেসে রুকাস আবার শুরু করল।

রুকাসের বয়স যখন ছয়, তখন বিশাল এক বায়োবট বাহিনী হামলা চালিয়েছিল তাদের এলাকায়; অনেকটা ট্রনদের হামলার মতো। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছিল সত্যি, কিন্তু হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এক জন মানুষকে খুঁজে বের করা। সেই মানুষটা হচ্ছে রুকাস। কেন এই ছয় বছরের শিশুটির জন্যে বায়োবটেরা এত ব্যস্ত হয়েছিল, সেটি তখনো কেউ জানত না। বায়োবটদের সেই ভয়ংকর হামলা থেকে রুকাস খুব অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল। তার বাবা-মা ভাই-বোন কেউ রক্ষা পায় নি।

এই ঘটনার পরও অসংখ্যবার রুকাসকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছে, কখনো সফল হয় নি। অসংখ্য মানুষের মাঝে কেন রুকাসকে নিয়ে যেতে তারা এত মরণপণ করে চেষ্টা করেছে সেটা কেউ জানত না, কিন্তু যেহেতু রুকাসকে নিতে চাইছে, মানুষেরা বুঝে গেল এর মাঝে কোনো একটা রহস্য আছে। রুকাসকে অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কে জয়ী হবে।

আমি রুকাসকে আবার বাধা দিলাম, কিন্তু সেটা কেমন করে হয়? তুমি তো বললে কাছাকাছি ভবিষ্যতের কিছু কেউ জানতে পারবে না।

জানতে পারবে না বলি নি, বলেছি জানার সম্ভাবনা কম।

মানে?

যদি অসংখ্যবার চেষ্টা করা যায়, খুব ছোট একটা সম্ভাবনা আছে কাছাকাছি ভবিষ্যৎ থেকে কোনো তথ্য আনার। মনে হয় বায়োবটেরা কিছু-একটা তথ্য এনেছে। যেখানে দেখা গেছে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু-একটা করেছি। কী করেছি আমি জানি

না।

তুমি জান না তুমি কী করেছ, কিন্তু সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ?

হ্যাঁ। তাই আমাকে অক্ষত দেহে বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবে হোক। বায়োবটেরা এত ভয়ঙ্করভাবে আমাকে খুঁজে বের করে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে, যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার একটিমাত্র উপায়—।

সেটা হচ্ছে অতীতে সরিয়ে ফেলা?

হ্যাঁ, আমি অজ্ঞাত কোনো জায়গায় লুকিয়ে না গিয়ে অজ্ঞাত কোনো সময়ে লুকিয়ে গেছি।

আমি অবাক হয়ে বুকাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৬. টুবু নামের রবোট

মায়ের অনাথাশ্রমের জন্যে একটা বড় কেক নিয়ে গিয়েছিলাম। একটি শিশুর জন্মদিন ছিল আজ। মা বড় একটা কেক তৈরি করেছিলেন। উপরে বড় বড় করে তার নাম লেখা ছিল। ট্রনদের হাতে তার বাবা-মা মারা না গেলে আজ তার নিজের বাসায় কত চমৎকার আনন্দোৎসব হত।

আমার আরো আগে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু জন্মদিনের উৎসবটি এত আনন্দঘন হয়ে উঠল যে দেরি হয়ে যাচ্ছে জেনেও আমি উঠে আসতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত যখন রওনা দিয়েছি তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রতীর ধরে হেঁটে আসছি, কোথাও কেউ নেই। মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। চারদিকে তার নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলোতে সবকিছু এত মায়াময় মনে হয় কেন কে জানে।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পানিতে চাঁদের প্রতিফলনটি উপভোগ করলাম। শান্ত সমুদ্র, ছোট ছোট ঢেউ কূলে এসে ভেঙে পড়ছে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি, দেখতে পেলাম আমার ঠিক সামনে এক জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভয়ানক চমকে উঠে বললাম, কে?

মানুষটি একটু এগিয়ে এল, আমি একটা ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম। এর শরীর ধাতব পদার্থে তৈরী। মানুষটি শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

মানুষটি বিজাতীয় ভাষায় কিছু-একটা বলল, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বললাম, কে? কে তুমি?

মানুষটি আরো খানিকক্ষণ নানা ধরনের বিচিত্র ভাষা বলে হঠাৎ পরিষ্কার আমার ভাষায় বলল, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?

নিশ্চয়ই পৃথিবীর সব রকম ভাষায় চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাষাটি খুঁজে পেয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, পারছি।

চমৎকার। লোকটি আরো এগিয়ে আসে, আমি এবারে চাঁদের আলোতে তাকে

স্পষ্ট দেখতে পাই। লোকটি মানুষ নয়, তার পুরো দেহ ধাতব। অনেকটা রবোটের মতো, কিন্তু এরকম রবোট আমি আগে দেখি নি। রবোটের মতো মানুষটি বলল, এই এলাকায় কয়েকদিন আগে তিনটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটেছে?

আমার খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে সে কী জানতে চাইছে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে ট্রনদের তিনটি মহাকাশযান ধ্বংসের কথা বলছে। আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, কেন?

সেই বিস্ফোরণগুলো কেমন করে ঘটেছে? এক জন তরুণ কি তার শরীরের ভেতর থেকে একটা অস্ত্র বের করে বিস্ফোরণগুলো ঘটিয়েছিল?

আমি কুলকুল করে ঘামতে থাকি। এই প্রাণীটি নিশ্চয়ই বায়োবট, রুকাসের খোঁজে এসেছে।

প্রাণীটি আবার জিজ্ঞেস করল, কেমন করে হয়েছিল সেই বিস্ফোরণ?

আমি জানি না।

তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমার গলার কাঁপন থেকে আমি বুঝতে পারছি তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমাকে বল সেই তরুণটি কোথায়।

আমি বলব না।

ভয়ঙ্কর সেই ধাতব দেহ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবে আমি আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম, কিন্তু সেটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না। বলল, তরুণটিকে আমার খুব প্রয়োজন। আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।

না।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। রবোটের মতো প্রাণীটি তার হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আমার মাথায় স্পর্শ করে, উচ্চচাপের বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো একটা অনুভূতি হয় আমার, ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু থাকে না আমার! চোখের সামনে লাল একটা পর্দা খেলতে থাকে, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ রুকাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি, টুবু!

রবোটের মতো প্রাণীটি সাথে সাথে ছেড়ে দিল আমাকে, তারপর ছুটে গেল রুকাসের দিকে, শিস দেয়ার মতো শব্দ করল মুখে একবার বিজাতীয় ভাষায়। আমি কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম, পুরাতন বন্ধু এক জন আরেকজনকে যেরকম গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, তেমনি করে রুকাস আলিঙ্গন করছে প্রাণীটাকে। এই রবোটের মতো প্রাণীটা আর যাই হোক, বায়োবট নয়। দ্রুত কোনো এক ভাষায় এক জন আরেকজনের সাথে কথা বলছে, দেখে মনে হয় কথা কাটাকাটি হচ্ছে, কিন্তু রুকাসের মুখে হাসি, নিশ্চয়ই ভাষাটিই এরকম।

একটু পরেই দু'জনে আমার দিকে এগিয়ে এল। রবোটের মতো প্রাণীটি আমার সামনে মাথা নিচু করে অভিনন্দন করার ভঙ্গি করে বলল, তোমার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎপ্রবাহ করানোর জন্যে দুঃখিত।

আমি বললাম, ভেবেছিলাম তুমি বায়োবট। আমি জানতাম না রুকাস তোমার বন্ধু।

রুকাস?

রুকাস হেসে বলল, হ্যাঁ, এখানে আমার নাম রুকাস।

রুকাস! কি আশ্চর্য নাম!

আমি রবোটটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি? তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ?

আমি টুবু। আমি সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট। রুকাসকে রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব আমার উপর ছিল। যেহেতু তার গোপনীয়তা নষ্ট হয়েছে, আমাকে তার সাহায্যের জন্যে আসতে হয়েছে।

টুবু নামক রবোটটি এবারে রুকাসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কেমন করে এত বড় একটা ভুল করলে? তিন তিনটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটালে এক জায়গায়? তুমি কোথায় আছ সেটা কি গোপন আছে আর?

তুমি আমার জায়গায় হলে তাই করতে। আমি তো মাত্র তিনটি বিস্ফোরণ করেছি, তুমি করতে ছয়টি।

টুবু মাথা নেড়ে বলল, আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চল তোমার বাসায়। তোমাকে ঘিরে একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ দাঁড় করাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমরা তিনজন আমাদের বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করি।

ঘরের আলোতে আমি প্রথমবার টুবুকে ভালো করে দেখলাম। বড় বড় ফটোসেলের চোখ, ছোট নাক এবং বিস্তৃত মুখে তার চেহারায় কেমন জানি একটি সারল্য রয়েছে। তার গলার স্বর খানিকটা ধাতব, যান্ত্রিক, এবং ভাবলেশহীন। আমি উপস্থিত থাকলে সে ভদ্রতা করে আমাদের ভাষায় রুকাসের সাথে কথাবার্তা বলে, যেন আমি বুঝতে পারি। তাদের নিজেদের ভাষা অত্যন্ত সুন্দর, সুরেলা এবং দ্রুত। মাঝে মাঝেই মনে হয় শিস দেয়ার মতো শব্দ হয়।

টুবু তার ঘাড়ের একটা বাক্স খুলে ভিতর থেকে জিনিসপত্র বের করতে থাকে। নানা আকারের ছোট–বড় যন্ত্রপাতি। সেইসব যন্ত্রপাতি খুলে গিয়ে নানা ধরনের আকৃতি নিতে থাকে। ঘন্টাখানেকের মাঝেই রুকাসের ঘরটি একটি অবিশ্বাস্য রূপ নিয়ে নেয়। ঘরের মাঝামাঝি লাল আলোতে এই পুরো এলাকার একটি ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে ওঠে। বাইরে থেকে যে–কেউ আমাদের এই এলাকায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে এই ত্রিমাত্রিক ছবিটিতে তাকে দেখা যাবে। সেটি ধ্বংস করার নানারকম উপায় রয়েছে এবং বন্ধুভাবাপন্ন নয় এরকম মহাকাশযানকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের কোনো ধরনের মহাকাশযান নেই এবং বাইরে থেকে শুধুমাত্র আমাদের উপর হামলা করার জন্যেই মহাকাশযানগুলো এসে হাজির হয় শুনে টুবু খুব অবাক হল।

রুকাসকে রক্ষা করার জন্যে এই পুরো এলাকা ঘিরে একটা শক্তিবলয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে টুবু অন্য কাজে মন দিল। প্রথমে রুকাসকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। রুকাস তার গায়ের কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে থাকে, টুবু তার উপর উবু হয়ে ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করতে থাকে। খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বলল, তোমার শরীর চমৎকার আছে। আমি যে ধরনের আশঙ্কা করেছিলাম সেরকম কিছু হয় নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি আশঙ্কা করেছিলে?

এখানকার স্থানীয় রোগ–জীবাণু এবং ভাইরাসে রুকাসের শরীর অভ্যস্ত নয়, সে

ধরনের কোনো কিছুতে আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানো কঠিন হবে। তার শরীরে নানারকম প্রতিষেধক এবং অ্যান্টিবডি দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো চমৎকার কাজ করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, টুবু, যদি রুকাসকে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে বায়োবট আসে, তুমি বুঝতে পারবে?

পারার কথা।

তারা কী আসবে?

আজ হোক কাল হোক, তারা আসবে।

কেন?

রুকাস যদি বেঁচে থাকে, বায়োবটের একটি মহাবিপর্যয় হবার কথা। আমাদের, মানুষের পক্ষে যেরকম রয়েছে রুকাস, বায়োবটদের দিকে তেমনি রয়েছে এক জন—ক্লডিয়ান। এই দু'জনের মাঝে এক জন বেঁচে থাকবে, কে বাঁচবে তার উপর নির্ভর করবে সবকিছু।

ক্লডিয়ান! আমি রুকাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ক্লডিয়ানের কথা শুনেছ?

শুনেছি।

সে কী রকম? কত বয়স? দেখতে কেমন?

আমি ঠিক জানি না।

টুবু বলল, ক্লডিয়ান বর্তমান বায়োবট গোষ্ঠীর দলপতি। তার বয়স সম্ভবত চল্লিশ থেকে ষাটের মাঝে। বায়োবটদের হিসেবে সেটা বলা যায় তরুণ। তাদের আয়ু আজকাল দু' শ' পঞ্চাশ থেকে তিন শ'য়ের কাছাকাছি।

সে দেখতে কেমন?

বায়োবটদের নিজেদের চেহারা নেই। অপুষ্ট মুখমণ্ডল যন্ত্রপাতিতে ঢাকা থাকে, সেই যন্ত্রের চেহারা হচ্ছে তাদের চেহারা।

ক্লডিয়ান কী রকম মানুষ?

ক্লডিয়ান মানুষ নয়, বায়োবট।

কিন্তু তার মাথায় এখনো মানুষের মস্তিষ্ক, তার চিন্তা–ভাবনা নিশ্চয়ই মানুষের।

রুকাস এবং টুবু দু'জনেই একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

টুবু বলল, কিন্তু তাদের শরীর এমনভাবে যন্ত্রের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যে, খুব বড় পরিবর্তন হয়েছে তাদের মস্তিষ্কে।

কিন্তু তবুও নিশ্চয়ই তারা মানুষ। তাদের চিন্তা–ভাবনা নিশ্চয়ই মানুষের মতো।

রুকাস মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তা নিশ্চয়ই সত্যি।

তাহলে তার চিন্তা–ভাবনা কী রকম?

আমি ঠিক জানি না।

টুবু বলল, ক্লডিয়ান খুব নিষ্ঠুর।

সকল বায়োবটমাত্রেই নিষ্ঠুর। ক্লডিয়ান তাদের দলপতি, তার নিষ্ঠুরতা অনেক বেশি।

আমি অবাক হয়ে টুবু এবং রুকাসের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভবিষ্যতের পৃথিবীর

পরিণতি কী হবে সেটি নির্ধারিত হবে এই মানুষ এবং রবোটগুলো দিয়ে। পুরো ব্যাপারটি ঘটছে আমার চোখের সামনে, আমার সেটি এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টুবু, তোমাদের এত ক্ষমতা, তোমরা ইচ্ছে করলেই এখন সারা পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলতে পার—কেন ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে পড়ে রয়েছ? কেন এখানে থেকে যাও না? সারা পৃথিবীর মাঝে তোমরা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

টুবু হাসির মতো শব্দ করে বলল, সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারটি তুমি জান না বলে তুমি এরকম কথা বলছ। কেউ যখন অতীতে আসে, তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

কেন?

সে যদি একটু ভুল করে, ভয়ংকর প্রলয় হয়ে যাবে প্রকৃতিতে। আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি। একটি অকারণ প্রাণীহত্যা হবে ভবিষ্যতের একটা প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলা। সময়ের অনিশ্চিত সূত্র যেটুকু করতে দেয়, তার ভেতরে থাকতে দেয় সব সময়।

তার মানে তোমরা এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারবে না?

না।

মানুষ মারতে পারবে না?

না।

কোনো কিছু ধ্বংস করতে পারবে না?

না।

কিন্তু রুকাস ট্রনদের তিনটি মহাকাশযান ধ্বংস করে ফেলেছিল।

প্রকৃতি তাকে সেটা করতে দিয়েছে—

আমার মা এই সময়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, সব সময়ে এই কচকচি ভালো লাগে না—তুই থাম্ দেখি, আমি কয়েকটা কাজের কথা বলি।

বলুন।

আজকাল কাপড় নিয়ে মহাযন্ত্রণা। তাপ-নিরোধক কাপড়গুলো যাচ্ছেতাই, ভালো কিছু তাপ-নিরোধক পাওয়া যায় কোথাও?

কী করবেন আপনি তাপ-নিরোধক কাপড় দিয়ে?

এই রান্নাবান্নার সময় কাজে লাগে। সেদিন ছোট একটা মাইক্রোভল্ট ফেটে কী কেলেঙ্কারি! এই যে দেখ বাবা, হাতটা পুড়ে গেছে।

রবোটের মুখে যেটুকু যান্ত্রিক সমবেদনা ফোটানো সম্ভব সেটুকু ফুটিয়ে টুবু গভীর মনোযোগ নিয়ে মায়ের হাতের পোড়া দাগটি লক্ষ করে বলল, খুবই দুঃখের ব্যাপার। আপনি কেমন করে রান্না করেন?

ছোট একটা ইউরেনিয়াম চুলো আছে, কতদিনের পুরানো, কে জানে রেডিয়েশান বের হয় কি না। তোমরা কেমন করে কর?

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এক জন রবোট বলে খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা নেই। মানুষদের জন্যে খাবার তৈরি করতে হয়। খাওয়া ব্যাপারটি আজকাল দু' ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে—শরীরের পুষ্টি এবং স্বাদ। পুষ্টির ব্যাপারটি ছোট ছোট ট্যাবলেটে করে চলে আসে। সেখানে ইচ্ছেমতো স্বাদ যোগ করা হয়।

মা অবাক হয়ে বললেন, তার মানে একই খাবারের ট্যাবলেটে মাংসের স্বাদ যোগ করা যাবে, আবার ইচ্ছে করলে মাছের স্বাদ?

ঠিক বলেছেন।

মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বাদগুলো কেমন করে যোগ কর? বোতলে কিনতে পাওয়া যায়?

আগে সেরকম ছিল। গত শতাব্দীতে পুরো ব্যাপারটি ইলেকট্রনিক করে ফেলা হয়েছে।

ই-ইলেকট্রনিক?

হ্যাঁ। স্বাদ জিনিসটা কী? আপনাদের মস্তিষ্কের একধরনের অনুভূতি। একটা খাবার মুখে দেবেন, জিব, গলা, নাক, মুখমণ্ডল সেই খাবারের অনুভূতিটি মস্তিষ্কে পাঠাবে, আপনারা সেটা উপভোগ করবেন! পুরো জিনিসটি শর্টকাট করে অনুভূতিটি সোজাসুজি মস্তিষ্কে দেয়া যায়, ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় সেসব করার জন্যে।

মা তখনো ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না। মাথা নেড়ে বললেন, মুখে কোনো খাবার না দিয়েই খাবারের স্বাদ অনুভব করা সম্ভব।

হ্যাঁ।

তোমরা সেটা কর?

আমি রবোট, তাই আমাকে করতে হয় না, মানুষেরা করে।

প্রত্যেক দিন করে? প্রত্যেক বেলায়?

টুবু আবার হাসির মতো একটু শব্দ করে বলল, প্রত্যেক বেলায় খাওয়ার সময় আর কতজনের আছে? যাদের সময় আছে, তারা দিনে একবার। ব্যস্ত মানুষেরা সপ্তাহে একবার। বিশেষ সময়ে মাসে একবার খাওয়া হয়। সেগুলো শরীরে একমাস সবরকম পুষ্টি পাঠায় ধীরে ধীরে—

তাই বল। রুকাস তাই কিছু খেত না প্রথম প্রথম।

হ্যাঁ, তাকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিকর খাবারের ট্যাবলেট খাইয়ে পাঠিয়েছিলাম।

মা খানিকক্ষণ চোখ বড় বড় করে থেকে বললেন, আচ্ছা বাবা, কাপড়ের ফ্যাশন কি আজকাল? ঢিলেঢালা, নাকি—সময় পরিভ্রমণের একটা প্রশ্ন মাথার মাঝে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু মায়ের জন্যে মনে হচ্ছে আজ সেটি আর জিজ্ঞেস করা হবে না।

৭. নূতন জীবন

আমাদের এই এলাকায় এত বড় একটা ব্যাপার ঘটছে, কিন্তু দেখে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই। টুবু তার মনমতো একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে পরদিন ভোরে আমার সাথে হাঁটতে বের হল। চমৎকার বসন্তকালের একটি সকাল, ঝোপঝাড়ে বুনো ফুল, পাখি ডাকছে, ঘাস-ফড়িং লাফাচ্ছে। আকাশ নীল, মেঘের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি কিরীণার বাসায় থেমে তাকে খোঁজ করলাম। তার মা বললেন, সে খুব

ভোরে তার আইসোটোপ আলাদা করার ছাঁকনিটি নিয়ে সমুদ্রতীরে চলে গেছে। আমি তখন টুবুকে নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে হাঁটতে থাকি।

অনেক দূর থেকে আমি কিরীণার গলা শুনতে পাই। সে এবং তার কয়জন বান্ধবী পাশাপাশি বসে সুর করে গান গাইতে গাইতে কাজ করছে। গানের বিষয়বস্তুটি খুব করুণ—ছোট একটি শিশু প্রতিদিন ভোরে সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বাবাকে ট্রনেরা ধরে নিয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসবে?

কিরীণার মিষ্টি গলার সেই করুণ সুর শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি হা হা করে ওঠে। টুবু পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, অত্যন্ত চমৎকার কণ্ঠ, প্রয়োজনীয় তরঙ্গের অপূর্ব সুষম উপস্থাপন!

যার অর্থ নিশ্চয়ই কি সুন্দর গান!

কিরীণা আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে গান থামিয়ে ফেলল। আমি বললাম, কী হল? থামলে কেন?

ভেবেছ তোমাকে গান শোনানো ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ নেই।

টুবু মাথা নিচু করে অভিবাদন করে বলল, তোমার গলার স্বরে যে তরঙ্গের উপস্থাপনা আছে সেটি একটি সুষম উপস্থাপনা। আমি নিশ্চিত, মানুষ সম্প্রদায় এই উপস্থাপনার যথাযথ মূল্য দেবে।

কিরীণা একটু অবাক হয়ে টুবুর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, এ হচ্ছে টুবু। রুকাসের বন্ধু, রুকাসকে সাহায্য করার জন্যে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে টুবু এক জন রবোট।

টুবু মৃদু স্বরে আমাকে মনে করিয়ে দিল, সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট।

কিরীণা নিজেকে সামলে নিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। টুবু সবাইকে অভিবাদন করে বলল, আমার মানুষ সম্প্রদায়কে খুব ভালো লাগে।

আমি হেসে বললাম, সাধারণত এই সময়ে সমুদ্রতীরে অনেক বাচ্চারা থাকে। আজ কেন জানি কেউ নেই।

কিরীণা বলল, ট্রনেরা যেসব রবোট ফেলে গেছে, বাচ্চারা সেগুলো দেখতে গেছে। কাছে যাওয়ার কথা নয়, তাই দূর থেকে ঢিল ছুড়ছে।

তাদের কাছে তো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র, গুলি করে দেবে কখন।

টুবু রবোট কথাটি উচ্চারিত হতে শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল। আমি তখন পুরো ব্যাপারটি তাকে খুলে বললাম। সব শুনে বলল, চল গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

কিরীণা এবং তার বান্ধবীরাও বলল, আমরাও যাব। চল।

আমরা কথা বলতে বলতে সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে থাকি। টুবু একটু বাক্যবাগীশ বলে মনে হয়, কথাবার্তায় সে-ই মোটামুটি প্রাধান্য নিয়ে নিল।

ট্রনেরা প্রায় হাজারখানেক রবোট ফেলে গিয়েছিল। অনুসন্ধানকারী রবোট, কিছু দেহরক্ষী, কিছু আক্রমণকারী রবোট। ট্রনেরা না থাকায় তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। কোনো ধরনের নেতৃত্ব দেয়া না হলে রবোটগুলো পুরোপুরি অক্ষম হয়ে যায় বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত এগুলোকে সেভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে। সমুদ্রতীরের এক নির্জন এলাকায় রবোটগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই,

ক্রমাগত নিজেদের মাঝে স্থান বদল করছিল, দূর থেকে মনে হয় কিছু অতিকায় কীট কিলবিল করছে। আমরা হেঁটে হেঁটে কাছে এসে দেখতে পাই এই এলাকার প্রায় সব শিশু এই রবোটগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি অক্ষম এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন এই রবোটগোষ্ঠীকে শিশুগুলো নানাভাবে জ্বালাতন করছে। বড় বড় পাথরের টুকরা জড়ো করা হচ্ছে এবং বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে সেগুলো ছুড়ে রবোটগুলোর কপেট্রনে আঘাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, খর্বাকৃতি অনুসন্ধানকারী রবোটের কপেট্রনের ডান দিকে মাঝারি পাথর দিয়ে বেশ জোরে আঘাত করতে পারলে রবোটটি পুরোপুরি মাথা-খারাপ হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আকাশে গুলি করতে থাকে। সেটি নাকি নিঃসন্দেহে একটি দর্শনীয় ব্যাপার।

টুবু খানিকক্ষণ রবোটগুলো লক্ষ করে বলল, বাচ্চারা যদি এগুলো দিয়ে খেলতে চায় খেলুক। কিন্তু আগে এগুলোকে নিরস্ত্র করা দরকার।

কেমন করে করবে?

বললেই হয়।

কাকে বলবে?

কেন, রবোটগুলোকে। ঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কিছু বিট পাঠিয়ে রিসেট করে নিলেই হল। মাস্টার মোডে গিয়ে ওদের যা কিছু বলা হবে ওরা সেটাই করবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি করতে পারবে সেটা?

কেন পারব না?

কর দেখি।

কি করব?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সবগুলো রবোটকে বল হাতের অস্ত্রগুলো ফেলে আমাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে। টুবু এগিয়ে গিয়ে যান্ত্রিক ভাষায় কী একটা বলতেই সবগুলো রবোট গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। হাতের অস্ত্র ফেলে সবগুলো পড়িমরি করে ছুটে আসতে থাকে। টুবুর কাছাকাছি এসে রবোটগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। প্রথমে অনুসন্ধানকারী রবোট, তার পিছনে দেহরক্ষী রবোট, সবার পিছনে আক্রমণকারী রবোট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রবোটগুলো আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে বলল, তার মানে ট্রনদের রবোটগুলো এখন আমাদের রবোট হয়ে গেল? এখন এগুলো আমাদের কথা শুনবে?

টুবু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তোমরা যদি চাও।

ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে বিশাল রবোটবাহিনী নিয়ে আমরা শহরতলিতে ফিরে চললাম। সবার সামনে টুবুকে নিয়ে আমি আর কিরীণা, পিছনে সারিবদ্ধ রবোট। এককেটা শিশু এককেটা রবোটের ঘাড়ে চেপে বসেছে, মাথায় চাটি মারছে, পা দিয়ে শব্দ করছে, কান ধরে টানছে, রবোটগুলো বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে হাঁটছে। এককথায় বলা যায়, একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য।

শহরের মাঝামাঝি ইলির সঙ্গে দেখা হল। ট্রনদের রবোটগুলো পোষমানা অনুগত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করছে খবর পেয়ে সে ছুটে আসছিল। খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে ছুটে এল। উত্তেজিত গলায়

বলল, কী হচ্ছে এটা কুনিল? কী হচ্ছে?

আমি টুবুকে দেখিয়ে বললাম, এ হচ্ছে টুবু। ব্রুকাসের বন্ধু। গতরাতে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে এক জন রবোট।

টুবু আবার মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল, সপ্তম বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রজাতির রবোট।

আমি ইলিকে দেখিয়ে বললাম, এ হচ্ছে ইলি। আমাদের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং শিক্ষক।

টুবু মাথা নিচু করে অভিবাদন করে বলল, ব্রুকাসকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইলি ইতস্তত করে বলল, তু-তুমি সবগুলো রবোটকে ঠিক করে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেমন করে করলে?

সব ডিজিটাল সিগনালে কাজ করে, অসুবিধে কোথায়?

তুমি আমার একটা কম্পিউটার ঠিক করে দিতে পারবে? অনেক কষ্ট করে আনা হয়েছে, কিন্তু মূল সিস্টেমে কী একটা সমস্যা রয়ে গেছে।

মনে হয় পারব। এই রবোটগুলো নিয়ে কী করবেন ঠিক করেছেন? আমি এর কর্তৃত্ব আপনাদের কারো হাতে তুলে দিতে চাই।

রবোটগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে গিয়ে সারাদিন কেটে গেল। পুরো এলাকার নানারকম কাজকর্মে এদের জুড়ে দেয়া হল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে একমাত্র নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরটির নিয়ন্ত্রণ কিছুই বাকি রইল না। আমাদের পুরো এলাকাটি, যেটি মাত্র গতকালও মোটামুটি মধ্যযুগীয় হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত, রাতারাতি সেটা আধুনিক হয়ে গেল।

রবোটসংক্রান্ত জটিলতা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইলি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল টুবুকে নিয়ে তার কম্পিউটারের সমস্যাটির একটি সমাধান করার জন্যে। আমি একদিন বিকেলে ব্রুকাস এবং টুবুকে নিয়ে বের হলাম। পথে যেতে যেতে কিরীণা আমাদের সাথে যোগ দিল এবং টুবুকে দেখে বরাবরের মতোই অসংখ্য ছোট ছোট শিশু আমাদের সাথে রওনা দিল। টুবু একটি রবোট ছাড়া কিছু নয়, মানুষের জন্যে তার অফুরন্ত ভালবাসা, বিশেষ করে শিশুদের জন্যে। সম্ভবত দুই হাজার বছর ভবিষ্যতের যে এলাকা থেকে সে এসেছে সেখানকার অল্পকিছু মানুষকে বায়োবটের ভয়ঙ্কর নির্যাতন সহ্য করতে দেখে মানুষ সম্পর্কে তার ধারণা চিরকালের জন্যে পাল্টে গেছে।

ইলির ঘরে বড় একটি কম্পিউটার খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। নানা আকারের কিছু মনিটরে দুর্বোধ্য নানাধরনের ছবি ও সংকেত খেলা করছে। টুবু একনজর দেখে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, একটা সহজ জিনিসকে এত জটিল করছেন কেন?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমি তো কিছু করি নি, যেরকম পেয়েছি সেরকমই আছে।

টুবু বলল, এই যন্ত্রণার মাঝে না গিয়ে গোড়া থেকে করে দিলে কেমন হয়?

ইলি ইতস্তত করে বলল, গোড়া থেকে?

হ্যাঁ, ঘন্টাখানেক সময় নেবে।

ঘ-ঘ-ঘন্টাখানেক? মাত্র ঘন্টাখানেক?

হ্যাঁ। এটা কতদিন থেকে এভাবে আছে?

এক বছরের একটু বেশি হল।

টুবু আবার হতাশ হবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে কাজ শুরু করে দিল।

টুবু একটি রবোট এবং তাকে তৈরি করা হয়েছে মানুষের সাথে কাজ করার জন্যে। কাজেই তার আচার-ব্যবহার মানুষের মতো, তার অঙ্গ-সঞ্চালনও মানুষের মতো। কিন্তু ইলির জন্যে এই কম্পিউটারটি দাঁড় করিয়ে দেবার সময়টিতে আশেপাশে কোনো মানুষ নেই, কাজেই তার মানুষের মতো অঙ্গ-সঞ্চালন করারও প্রয়োজন নেই। টুবু দ্রুত কাজ করতে শুরু করে, তার হাত এত দ্রুত নড়তে থাকে যে আমরা সেটিকে প্রায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হতে থাকে একটি অতিকায় পতঙ্গ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুবু এক ঘন্টার আগেই কাজ শেষ করে ফেলল। ইতস্তত বড় বড় মনিটরে বিচিত্র ছবি খেলা করতে থাকে। টুবু বলল, কাজ শুরু করার জন্যে মোটামুটি তৈরি হয়েছে। আজকাল আপনারা কী ভাবে মূল কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন জানি না। আপানাদের নিজস্ব কি ডাটাবেস আছে?

ইলি মাথা চুলকে বলল, আমাদের নেই, গড়ে তুলতে হবে।

নেই?

না।

ট্রনদের যেটা আছে সেটা ব্যবহার করছেন না কেন?

ইলি আকাশ থেকে পড়ল, সেটা কেমন করে করব? যোগাযোগ করব কেমন করে? আর যোগাযোগ যদি করিও, আমাদের ব্যবহার করতে দেবে কেন?

কেন দেবে না? সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন। টুবু একটা মনিটরের সামনে বসে দ্রুত কিছু সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণেই ট্রনদের মূল কম্পিউটারে যোগাযোগ করে ফেলল। মনিটরে বিচিত্র সংখ্যা এবং ছবি খেলা করতে থাকে। ইলিকে দেখিয়ে বলল, এই যে মূল কম্পিউটারের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুটি। এখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সবকিছু?

হ্যাঁ, সবকিছু।

এখানে এত সহজে যাওয়া যায়?

আপনারা এত সহজে যেতে পারবেন না। বিশাল দু'টি প্রাইম সংখ্যা ব্যবহার করে এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের জন্যে সেটি তো কোনো সমস্যা নয়।

তার মানে আমরা এখন ট্রনদের মূল নিয়ন্ত্রণে কী হচ্ছে দেখতে পারব?

শুধু দেখতে পাবেন না, সেটা নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন।

তার মানে আমরা যদি এটা ব্যবহার করা শিখে যাই—আজ থেকে এক মাস কিংবা দুই মাস পরে—আমরা ট্রনদের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব?

এক মাস দু'মাস পরে কেন? এখনই, এই মুহূর্তে আপনারা নিরাপদ।

কিন্তু এই জটিল সফ্টওয়ার তো আমরা ব্যবহার করতে পারি না। শিখতে সময়

নেবে। এই ধরনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মানুষ খুব কম। বেশির ভাগ মানুষই এখানে অন্য ধরনের কাজ করে।

টুবু মনে হল সমস্যাটি ঠিক বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মানুষ কম বলছেন কেন? এই যে বাচ্চারা খেলছে, তাদের কাজে লাগিয়ে দিন।

বাচ্চাদের?

হ্যাঁ। বারো-তেরো বছরের বাচ্চা এসব কাজের জন্যে সবচেয়ে ভালো, মস্তিষ্ক মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে, দায়িত্ববোধের জন্ম নিচ্ছে, নূতন জিনিস শেখার জন্যে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে?

কিন্তু তাদের শেখাবে কে?

শেখাবে? টুবুকে আবার একটু বিভ্রান্ত মনে হল। বলল, আপনাদের মস্তিষ্কে তথ্য পাঠানোর সরাসরি ব্যবস্থা নেই?

ইলি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, সেটা কী জিনিস?

মস্তিষ্কের নিউরনে তথ্যগুলো সোজাসুজি পাঠিয়ে দেয়া হয়। একটা বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় যন্ত্র। আমার কাছে আছে, ব্লুকাসকে আপনাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে শেখানোর জন্যে এনেছিলাম। সেটা ব্যবহার করে সবাইকে শিখিয়ে দেব।

ছোট ছোট বাচ্চারা, যারা এতক্ষণ মজা দেখার জন্যে জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা কিছুক্ষণের মাঝেই মনিটরের সামনে বসে পড়ে। টুবু ছোট যন্ত্রটি ব্যবহার করে মস্তিষ্কে কম্পিউটারসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পাঠিয়ে দেবার পর তারা অবিশ্বাস্য দক্ষতায় কাজ শুরু করে। বাইরে অন্ধকার নেমে আসতে থাকে, কিন্তু কাউকে মনিটরের সামনে থেকে নাড়ানো যাচ্ছিল না।

পরদিন বিকেলবেলা ডিয়ান নামে এগারো বছরের একটি ছেলে প্রথমবার ট্রনদের একটি মহাকাশযানকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হল। পুরো ব্যাপারটি ঘটল ইলির ঘর থেকে। মহাকাশযানটির পুরো নিয়ন্ত্রণ দখল করে সেটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে উত্তরাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হল। মনুষ্যবিহীন এই মহাকাশযানটি কী ভাবে আকাশে উড়ে ধ্বংস হয়ে গেল বের করার আগেই ট্রনদের এলাকায় আরো বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের বৈদ্যুতিক সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল, মধ্য অঞ্চলের যাবতীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা অনিশ্চিত করে দেয়া হল এবং খাদ্য সরবরাহের একটি মূল ব্যবস্থা হঠাৎ করে অকেজো হয়ে গেল।

এত দ্রুত এত বড় একটি ব্যাপার ঘটতে পারে, সেটি সবার ধারণার বাইরে ছিল। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসে অল্প কয়জন কিশোর-কিশোরী ট্রনদের জগতে এত বড় বিপর্যয় ঘটাতে পারে জানার পর সবাই হঠাৎ করে ব্যাপারটি আরো গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করতে শুরু করে। বিপর্যয়টি চোখের সামনে ঘটছে না, কাজেই সবার অগোচরে অত্যন্ত হৃদয়হীন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে।

ইলির বাসায় সন্ধেবেলা সবাই একত্র হয়েছে। প্রথমে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ইলি বলল, আপনারা সবাই জানেন, আমরা ট্রনদের এলাকায় আঘাত হানার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছি। আমাদের কয়েকজন কিশোর-কিশোরী পুরো ব্যাপারটিতে এত

দক্ষতা অর্জন করেছে যে কিছুদিনের মাঝেই তারা ইচ্ছে করলে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত কিছু ট্রন-বিমানকে আকাশে উড়িয়ে নিতে পারে, পারমাণবিক বোমা ফেলে তাদের শহর-নগর ধ্বংস করে দিতে পারে। এটি অচিন্তনীয় ক্ষমতা, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের কিশোর-কিশোরীদের সেই ধরনের একটা ক্ষমতা অর্জন করতে দেয়া ঠিক নয়, আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া উচিত।

আমি লক্ষ করলাম, যেসব কিশোর-কিশোরী গত কয়েকদিন কম্পিউটারের মনিটরের সামনে অসাধ্য সাধন করেছে, তারা হঠাৎ করে নিজেদের ভেতরে গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। ইলি একসময় থেমে গিয়ে বলল, তোমরা কিছু বলবে?

ডিয়াল মাথা নাড়ল।

কী বলবে?

তুমি যেটা বলেছ আমরা আসলে সেটা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি।

ইলি চমকে উঠে বলল, কি করে ফেলেছ?

পারমাণবিক বোমা নিয়ে কুড়িটা প্লেনকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি।

কী বললে? কী-কী-বললে?

কুড়িটা প্লেন গত দুই ঘন্টা থেকে ট্রনদের আকাশে উড়ছে।

কেন?

আমরা ওদের বলেছি, আমাদের যাদের ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের সবাইকে আজ রাতের মাঝে ফিরিয়ে দিতে হবে।

আমার হঠাৎ করে মনে পড়ল ডিয়াল নামের এই কিশোরটির মা অত্যন্ত রূপবতী মহিলা, গতবার ট্রনেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ডিয়ালের বাবা তার কিছুদিনের মাঝেই আত্মহত্যা করেছে। সে নিজে সেই থেকে আমার মায়ের অনাথাশ্রমে বড় হচ্ছে।

ইলি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যদি ওরা ফেরত না দেয়?

ডিয়াল শান্ত স্বরে বলল, তাহলে প্রতি এক ঘন্টায় একটা করে বোমা ফেলা হবে।

তু-তু-তুমি জান একটা পারমাণবিক বোমা ফেললে কত জন মানুষ মারা যায়? জা-জা-জান? উত্তেজনায় ইলির মুখে কথা আটকে যেতে থাকে।

ডিয়াল মাথা নাড়ল, জানি। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার মাকে বাঁচানোর জন্যে দরকার হলে আমি পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলব।

কেউ কোনো কথা বলল না।

ভোররাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল একটি হেলিকপ্টারের শব্দে। আমাদের কোনো হেলিকপ্টার নেই, নিশ্চয়ই ট্রনদের হেলিকপ্টার। ডিয়ালের মা এবং অন্যান্যদের ফিরিয়ে দিতে এসেছে ট্রনেরা।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি, আর আমাদের পশুদের মতো বেঁচে থাকতে হবে না। পৃথিবীর মাঝে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারব প্রথমবারের মতো।

৮. ক্লডিয়ান

কয়দিন থেকে রুকাস এবং টুবুকে একটু চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে। রুকাসের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে, কিন্তু টুবুর মুখে তার কোনো চিহ্ন পড়ার উপায় নেই। তবুও আমার টুবুকে দেখেই মনে হল কিছু-একটা ঘটছে। সে আজকাল কথা বলে কম, কয়েকবার প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং তার উত্তরগুলো হয় সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ সময় সে লাল রঙের ত্রিমাত্রিক ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের অসংখ্য মনিটরে কী-যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং মাঝে মাঝেই রুকাসের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে।

আমি একসময় জিজ্ঞেস করলাম, রুকাস, কী হয়েছে? তোমাদের দেখে মনে হয় কিছু-একটা ঘটেছে।

হ্যাঁ, মনে হয় তারা এসেছে।

কারা?

বায়োবটেরা।

তারা কোথায়?

সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখানেই আছে, কিন্তু দেখতে পারছি না। কেমন যেন ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেন তাদের দেখতে পারছি না?

টুবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনে হয় সময় মাত্রায় সবসময় একটু এগিয়ে রয়েছে, আমরা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কিছু-একটা পরিকল্পনা করছে ওরা। এইখানেই আছে ওরা আমাদের আশেপাশে।

আমার হঠাৎ করে কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চারদিকে তাকিয়ে বললাম, এখনো তো কাউকে দেখি নি।

হঠাৎ করে দেখবে। মনে হয় হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিছু বোঝার আগে।

সত্যিই তাই হল।

আমি আর কিরীণা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সন্ধে হয়ে আসছে। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়ে চারটি মূর্তি বের হয়ে এল। আমরা একটা শব্দ করার আগে মূর্তি চারটি আমার হাত ধরে কোথায় যেন লাফিয়ে পড়ল। সাথে সাথে চারদিক ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। সামনে অন্ধকার একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে, চারটি মূর্তি আমাদের দু'জনকে ধরে নিচে নামিয়ে নিতে থাকে। চারদিকে কেমন জানি অবাস্তব ঘোরের মতো, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি চোখ খোলা রাখতে, কিন্তু চোখের উপর ভারী পর্দার মতো কী যেন নেমে আসে।

আমার মাঝে মাঝে ভাসা ভাসা জ্ঞান এসেছে, আবার অচেতন হয়ে গেছি। মনে হয়েছে কেউ-এক জন আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টির সামনে আমি ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছি। এইভাবে কতকাল গিয়েছে কে জানে। মনে হয় এক যুগ—মনে হয় এক শতাব্দী। তারপর শেষ পর্যন্ত একদিন আমি চোখ খুলে তাকিয়েছি। আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে একটি ধাতব মুখ। আমি চোখ খুলতেই মুখটি সরে গেল, আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি ক্লডিয়ান।

ক্লডিয়ান!

আমি ভালো করে তাকালাম। এই তাহলে সেই বায়োবট দলপতি? মানুষের সমান উঁচু দেহ। প্রায় মানুষের মতোই যান্ত্রিক চেহারা। গোলাকার এনোডাইজ অ্যালুমিনিয়ামের মতো কালো মাথা। সরু সরু সবুজ একজোড়া নিষ্পলক চোখ। নাক আর মুখের জায়গায় ত্রিকোনাকৃতি ফুটো, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে জটিল সংবেদনশীল যন্ত্র। কুস্তিগীরদের মতো বিশাল দেহ। সমস্ত দেহে প্রচণ্ড শক্তির একটা ছাপ। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, দুই পা বিস্তৃত করে ক্লডিয়ান আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়?

তুমি আমার ঘরে।

কিরীণা কোথায়?

কিরীণা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে।

আমি চুপ করে ক্লডিয়ানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্লডিয়ান বলল, তুমি কুনিল?

হ্যাঁ। আমি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে কেন এনেছ?

আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

তুমি রুকাসকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলে, সেজন্যে আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কি প্রশ্ন?

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সময় রুকাস যখন সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেটি কি ইচ্ছাকৃত ছিল?

আমি প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠলাম, ক্লডিয়ান নামের এই বায়োবট আমাকে এই প্রশ্নটি কেন করছে? আমার তখন মনে হয়েছিল রুকাস জানত সে যতই জলোচ্ছ্বাসের দিকে এগিয়ে যাবে জলোচ্ছ্বাস ততই পিছিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো হতে পারে না, উন্মত্ত সমুদ্র কে তো এক জন মানুষ থামিয়ে দিতে পারে না।

ক্লডিয়ান আবার বলল, উত্তর দাও।

আমি ইতস্তত করে বললাম, আমি জানি না।

তোমার কি মনে হয়েছিল সে জানত এটি ঘটবে? উন্মত্ত সমুদ্রকে সে স্তব্ধ করে দিতে পারবে?

আমার তাই মনে হয়েছিল।

ক্লডিয়ান একটি নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, টুন মেয়েটি যখন রুকাসকে গুলি করেছিল, রুকাস কি জানত মেয়েটি তাকে গুলি করতে পারবে না?

আমি—আমি জানি না।

তুমি খুব অবাক হয়েছিলে। কেন অবাক হয়েছিলে?

তুমি কেমন করে জান আমি অবাক হয়েছিলাম?

ক্লডিয়ান শান্ত স্বরে বলল, আমরা তোমার মস্তিষ্ক স্ক্যান করেছি। তোমার মস্তিষ্কের সমস্ত তথ্য আমরা জানি। তুমি কেন অবাক হয়েছিলে?

আমার কেমন জানি সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। খানিকক্ষণ ক্লডিয়ানের ভাবলেশহীন যান্ত্রিক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, আমার মনে হয়েছিল

রুকাস জানে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ক্লডিয়ান দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমাকে সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ।

আমি কি এখন ফিরে যেতে পারি?

যখন সময় হবে তখন তুমি ফিরে যাবে।

আমার বুক কেঁপে ওঠে, জিজ্ঞেস করলাম, কখন সেই সময় হবে?

আমি এখনো জানি না। ক্লডিয়ান পিছনে ফিরে হেঁটে চলে যেতে শুরু করে।

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

ক্লডিয়ান থমকে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি প্রশ্ন?

তোমরা কেন মানুষ হয়ে বেঁচে না থেকে বায়োবট হয়ে বেঁচে থাকতে চাও?

যে কারণে রুকাস বায়োবট হতে চায় না, সে কারণে আমি মানুষ হতে চাই না। আমি বায়োবট সমাজে বায়োবট-শিশু হয়ে জন্মেছি। আমি বায়োবট হয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু তোমরা শুধু বায়োবট থাকতে চাও না, যারা বায়োবট হবে না তাদের তোমরা ধ্বংসও করে ফেলতে চাও।

আমরা তাদের ধ্বংস না করলে তারা আমাদের ধ্বংস করবে।

কিন্তু তোমরা যা কর সেটা অস্বাভাবিক, সেটা অপ্রাকৃতিক।

আদিম মানুষ যখন প্রথমবার আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিল, সেদিন প্রথম অপ্রাকৃতিক কাজ করা হয়েছিল। সেই অপ্রাকৃতিক কাজ কতটুকু করা হবে, কোথায় থামতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার নেই, অর্বাচীন তরুণ।

ক্লডিয়ানের গলার স্বরে এতটুকু উত্তাপ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আমি তবু বুঝতে পারি সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। আমি কেমন জানি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, বললাম, আমি শুনেছি তোমরা অচিন্তনীয় নিষ্ঠুর। তোমরা অবলীলায় মানুষ হত্যা কর।

এই মুহূর্তে তোমার শরীর কয়েক লক্ষ ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করছে। ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করা হলে সেটি নিষ্ঠুরতা নয় কেন?

সেটি করতে হয় বেঁচে থাকার জন্যে।

আমরাও হত্যা করি বেঁচে থাকার জন্যে। আমরাও হত্যা করি প্রয়োজনে। প্রয়োজনের হত্যাকাণ্ড নিষ্ঠুর হতে পারে না।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটি অসমসাহসিক কাজ করে ফেললাম, বললাম, আমি কি তোমার জৈবিক শরীরটি দেখতে পারি? তোমার অপুষ্ট শরীর? তোমার বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহ?

ক্লডিয়ানের শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। আমি বুঝতে পারি প্রচণ্ড ক্রোধে সে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি, এক মুহূর্তে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু ক্লডিয়ান সেটি করল না, তার বদলে একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। ক্লডিয়ান হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। শেষ পর্যন্ত একটি ঝটকা দিয়ে সেটি উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

আমি যেখানে আছি সেই ঘরটির মনে হয় কোনো শুরু নেই কিংবা কোনো শেষ নেই। যতদূর দেখা যায় বিশাল শূন্যতা। উপরে তাকিয়ে থাকলে বুকের ভেতর গভীর শূন্যতায় হা হা করে ওঠে। আমি প্রথম প্রথম ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করি; আজকাল চুপচাপ বসে থাকি। আমি জানি না আমাকে কেন এখানে এনেছে, আমি জানি না কখন আমাকে যেতে দেবে। শুয়ে শুয়ে আমার ঘুরেফিরে কিরীণার কথা মনে হয়। পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম দু'জনে, হঠাৎ করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে, কিরীণার কী হয়েছে তখন? তাকেও কি ধরে এনেছে ওরা? আমার মতো সেও কি বিশাল শূন্য এক প্রান্তরে বসে আমার কথা ভাবছে?

মাঝে মাঝে আমার চোখে গভীর ঘুম নেমে আসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখি! সেই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। কে যেন আমাকে বিচিত্র সব প্রশ্ন করে, আমি তার উত্তর ভেবে পাই না।

তারপর হঠাৎ একদিন আমার ঘুম ভেঙে যায়, আর দেখতে পাই আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে ধাতব একটি মুখ, সবুজ নিষ্পলক চোখ। আমি ফিসফিস করে বললাম, কে তুমি, ক্লডিয়ান?

হ্যাঁ।

আমাকে যেতে দেবে?

যখন সময় হবে তখন।

কখন সময় হবে?

আমি এখনো জানি না।

কিন্তু আমি যে আর পারি না।

তুমি কি কিছু চাও?

আমি যেতে চাই।

অন্য কিছু চাও?

এই নৈঃশব্দ আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। কোনো সংগীত কি শুনতে পারি? কোনো মিষ্টি সুর?

সংগীত! ক্লডিয়ান হঠাৎ চমকে উঠল। সংগীত?

হ্যাঁ। কোনো সংগীত।

না। ক্লডিয়ান হঠাৎ চিৎকার করে বলল, না, তুমি কোনো সংগীত শুনতে পাবে না। না। না।

আমি হকচকিয়ে গেলাম, বললাম, কেন নয়?

ক্লডিয়ান আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে যেতে দেব।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কখন?

এখনই। যাও, তুমি যাও। রুকাসকে বল আমি তাকে সামনাসামনি দেখতে চাই।

বলব।

যাও।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, সাদা কুয়াশার মতো একটি ধোঁয়া আমাকে ঘিরে ফেলতে থাকে, আমার চোখ ভারী হয়ে আসতে থাকে, হঠাৎ শুনতে পাই ক্লডিয়ান বলছে, যাবার আগে আমাকে একটি কথা বলে যাও।

কি?

তুমি কেন কিরীণাকে এত ভালবাস?

আমি জানি না।

জান না?

না।

গভীর ঘুমে আমি অচেতন হয়ে গেলাম। ছাড়াছাড়াভাবে দেখলাম, আমি বিশাল বালুবেলায় ছুটে যাচ্ছি, আমার পিছনে তাড়া করছে হাজার হাজার বুনো কুকুর। আমি চিৎকার করে ছুটছি, চিৎকার করে ছুটছি। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম আমার হাতের নখ বড় হয়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে বের হয়ে আসছে কুৎসিত দাঁত, আমি একটা দানবে পাল্টে যাচ্ছি—ভয়ঙ্কর বীভৎস দানব! বুনো কুকুরের দল থমকে দাঁড়িয়েছে আমাকে দেখে, তারপর প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলাম আমি, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল আমার। চোখ খুলে দেখলাম আমি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে কিরীণা, বলছে, কুনিল, কী হল তোমার? কী হল?

আমি কোথায়?

এই তো এখানে।

আমি কেমন করে এলাম?

কেমন করে এলে মানে? কিরীণা অবাক হয়ে বলল, তুমি তো এখানেই ছিলে!

এখানেই ছিলাম! কতক্ষণ থেকে?

সবসময়ই তো এখানে ছিলে!

সবসময়ই?

হ্যাঁ, কথা বলতে বলতে হঠাৎ তুমি চোখ বন্ধ করে পড়ে যাচ্ছিলে।

তারপর?

আমি তোমাকে ধরেছি আর তুমি চোখ মেলে তাকিয়েছ।

আর কিছু হয় নি?

না।

আমি বিভ্রান্তের মতো কিরীণার দিকে তাকালাম। কিরীণা অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার?

আমাকে ক্লডিয়ান ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কিরীণা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমার মাথা-খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, সত্যি।

আমি বুঝতে পারি, কিরীণা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। কিন্তু সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঠিক আছে কুনিল, চল, এখন বাসায় যাবে।

আমি কিরীণার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

কিরীণা আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। আমার হঠাৎ কী মনে হল জানি না, বাম হাতটি চোখের সামনে তুলে ধরলাম। হাতের কনুইয়ের কাছে একটা কাটা দাগ। দেখে মনে হয় পুরানো একটা ক্ষত।

আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। কারণ আমার এখানে কোনো ক্ষত চিহ্ন ছিল না। আমি ফিসফিস করে বললাম, এই দেখ—ক্লডিয়ান আমার হাতের মাঝে কেটে কিছু-একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কিরীণা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, আমার এখন রুকাসের কাছে যেতে হবে।

কিরীণা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, তুমি রুকাসের কাছে যেতে পারবে না। কিছুতেই যেতে পারবে না।

কিরীণা হঠাৎ শক্ত করে আমার হাত ধরে রাখে।

৯. মুখোমুখি

টুবু আমাকে টেবিলে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। বাম হাতটা একপাশে লম্বা করে রেখে সেটিকে শক্ত করে ধরে রেখে ধারালো একটা চাকু দিয়ে পুরানো ক্ষতটা নূতন করে চিড়ে ফেলল। ব্যথা লাগল না মোটেও, কী একটা ইনজেকশান দিয়ে পুরো হাতটা অবশ করে রেখেছে। কাটা অংশ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল, খানিকটা তুলো দিয়ে সেটা চেপে ধরে টুবু হাতের চামড়ার নিচে থেকে পাতলা একটি চাকতির মতো জিনিস বের করে আনে।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখে বললাম, কী এটা?

ডিস্ক বিস্ফোরক। আমি নিশ্চিত, রুকাসের গলার স্বর প্রোগ্রাম করে রাখা আছে, সেটি শুনতে পারলেই বিস্ফোরণ ঘটবে।

টুবু কিরীণার দিকে তাকিয়ে বলল, কিরীণা, ভবিষ্যতের পৃথিবী আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, রুকাসের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

কিরীণা লজ্জা পেয়ে একটু হাসল। টুবু বলল, কুনিলকে তুমি রুকাসের কাছে যেতে না দিয়ে অসম্ভব বুদ্ধির কাজ করেছ।

কিরীণা ইতস্তত করে বলল, আমি জানি না, কেন জানি মনে হল কুনিলকে রুকাসের কাছে যেতে দেয়া যাবে না।

আমি বললাম, এখন তো কোনো ভয় নেই, আমাকে কি উঠতে দেবে টেবিল থেকে?

টুবু আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়াও, আমি তোমাকে ভালো করে আরেকবার পরীক্ষা করে নিই।

পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে টুবু আমার বাঁধন খুলে দেয়। আমি টেবিলে বসে বললাম, এই বিস্ফোরকটি কি ফেলে আসবে কোথাও?

হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক এটি, খুব সতর্কভাবে ফেলতে হবে। খানিকক্ষণ সময়

দাও আমাকে, আমি এটা খুলে বিস্ফোরকটি আলাদা করে ফেলি।

ফেটে যাবে না তো আবার?

উত্তরে টুবু হাসার মতো একধরনের শব্দ করল।

ডিস্ক বিস্ফোরকটি থেকে রুকাসের গলার স্বরের সাথে প্রোগ্রাম করা মাইক্রো-ইলেকট্রনিক অংশটা আলাদা করে টুবু আমাকে নিয়ে রুকাসের কাছে রওনা দিল। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে সে রুকাসের সাথে একবার কথা বলতে চায়।

আমার মুখ থেকে পুরোটা শুনে রুকাস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মা বললেন, এটা কেমন করে হয় যে তুই এতদিন ওর সাথে থেকে এলি, আর কিরীণা জানতেও পারল না, তোর মনে হল তুই সেখানেই আছিস?

টুবু বলল, ওকে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে সময় সামনেও প্রবাহিত হয় না, পিছনেও হয় না। বায়োবটরা এ ব্যাপারে মানুষের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

মা বললেন, এই সন্ধেবেলা পাহাড়ের নিচে যাওয়ার দরকার কি ছিল? সাপখোপ কত কী আছে সেখানে!

কিরীণা বলল, অনেক যখন রাগ হল ক্লডিয়ান, তখন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কেন সে?

টুবু বলল, সেটা তো জানি না।

রুকাস বলল, আমার মনে হয় কি জান?

কি?

আমরা বায়োবটদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটি খুঁজে পেয়েছি।

কী?

বায়োবটেরা যান্ত্রিক উৎকর্ষের চরমে পৌঁছে গেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবন অত্যন্ত নিখুঁত। সেখানে কোনো ভুলত্রুটি নেই। সেটি নির্ভুল। সেখানে অনুভূতির স্থান নেই। সাধারণ মানুষেরা যখন তীব্র আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখনো বায়োবটেরা থাকে আশ্চর্য ধীরস্থির। তাদের মস্তিষ্ক সবসময়েই শান্ত। সেখানে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। তাদের যান্ত্রিক শরীর সেই শান্ত মস্তিষ্কের সাথে নির্ভুলভাবে কাজ করে।

রুকাস খানিকক্ষণ নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু সেই মস্তিষ্ক যদি বিচলিত হয়ে ওঠে, ক্রোধ কিংবা ভালবাসা, আনন্দ কিংবা দুঃখ যাই হোক, সেই আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে একসময়, শরীরের যান্ত্রিক যোগাযোগ হঠাৎ করে মস্তিষ্কের সাথে আর তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ করে শরীরের একটি দু'টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। তাই ক্লডিয়ান যখন ভয়ঙ্কর রাগে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

কিরীণা জ্বলজ্বল চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই কুনিল যখন সংগীতের কথা বলেছিল, ক্লডিয়ান এত আপত্তি করেছিল?

হ্যাঁ। রুকাস মাথা নাড়ে। আমরা জানি বায়োবট-জগতে কোনো সংগীত নেই। বায়োবট-শ্লোগান হচ্ছে, "সংগীত কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ন করে"। প্রকৃত ব্যাপারটি ভিন্ন, সংগীত আসলে তাদের শরীরের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাঝে আঘাত করে। মানুষের মস্তিষ্ক, তার আবেগের গভীরতা এত বিশাল, পৃথিবীর কোনো যন্ত্র তার সাথে সর্বক্ষণ

তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না।

রুকাস খুব শান্ত গলায় বলল, এক জন সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ। একটি রবোট পরিপূর্ণ একটি যন্ত্র। এক জন বায়োবট পরিপূর্ণ নয়, সে অসম্পূর্ণ। মানুষের মস্তিষ্কে তার রয়ে গেছে মানুষের আবেগ, কিন্তু সেই তীব্র আবেগকে নিয়ন্ত্রণের মতো তার যান্ত্রিক দেহ নেই। পৃথিবীতে যদি কোনো সত্যিকার মানুষ না থাকে, বায়োবটের কোনো ভয় নেই। কিন্তু একটি মানুষও যদি বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাদের দেখিয়ে দিতে পারে এই ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি।

রুকাস উত্তেজিত হয়ে ঘরের মাঝে পায়চারি করতে থাকে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে বলল, বায়োবটদের সাথে আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ অস্ত্র দিয়ে হবে না, প্রকৃত যুদ্ধ হবে সংগীত দিয়ে, শিল্প দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে—তাদের বলতে হবে অসম্পূর্ণ হয়ে থেকো না, পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাক, পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে।

রুকাস হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আমি সব সময় খুব অবাক হয়ে ভাবতাম, পৃথিবীর এত বায়োবটদের সাথে এই ভয়ংকর যুদ্ধে আমি কেমন করে নেতৃত্ব দেব? আমি যোদ্ধা নই, আমি নেতা নই, আমি সাধারণ, খুব সাধারণ এক জন মানুষ। তবে হ্যাঁ, আমার বুকের ভেতরে আমি সবসময় অনুভব করি তীব্র আবেগ। ক্ষুদ্র একটা জিনিসে আমি অভিভূত হয়ে যাই। বায়োবটদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র এটা।

আমি ইতস্তত করে বললাম, রুকাস।

বল।

এই জিনিষটি তুমি হঠাৎ করে বুঝতে পারবে, সে জন্যেই কি বায়োবটেরা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?

রুকাস জ্বলজ্বলে চোখে বলল, আমার তাই ধারণা।

তারা তোমাকে হত্যা করতে পারে নি, তুমি এটা ভেবে বের করেছ, তাহলে কি বলতে পারি বায়োবটেরা মানুষের সাথে যুদ্ধে হেরে গেল?

রুকাস কেমন একটি বিচিত্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আমি জানি না কুনিল, কিন্তু আমি তাই প্রার্থনা করি। তাই প্রার্থনা করি।

আমার মা বিড়বিড় করে বললেন, হে ঈশ্বর, হে পরম আত্মা। তুমি রক্ষা কর, মানব জগতকে তুমি রক্ষা কর।

কিরীণা নিচু স্বরে বলল, রুকাস।

বল কিরীণা।

তুমি যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সামনে দাঁড়িয়েছিলে, জলোচ্ছ্বাস থেমে গিয়েছিল। ট্রন মেয়েটি তোমাকে গুলি করে মারতে পারে নি। কুনিলের শরীরের বিস্ফোরক সরিয়ে নেয়া হয়েছে—প্রকৃতি সবসময় তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হ্যাঁ কিরীণা।

বাঁচিয়ে রেখেছে, কারণ তুমি যেন এই সত্যটি বুঝতে পার। বায়োবটদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পার।

আমার তাই ধারণা।

এখন তুমি সেই সত্যটি জেনে গেছ। তোমার দায়িত্ব তুমি শেষ করেছ।

হ্যাঁ।

প্রকৃতির তোমাকে আর রক্ষা করার প্রয়োজন নেই?

রুকাস খানিকক্ষণ একদৃষ্টে কিরীণার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি জানি না কিরীণা। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ধারণা সত্যি।

ক্লডিয়ান যখন তোমাকে হত্যা করতে আসবে, তোমাকে প্রকৃতি আর রক্ষা করবে না?

রুকাস ফিসফিস করে বলল, মনে হয় না।

কেন জানি হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, রুকাসের ঘরে টুবু নিচুস্বরে কথা বলছে। রুকাস আর মা চুপচাপ বসে আছে লাল ত্রিমাত্রিক ছবিটি ঘিরে। টুবু বলল, ক্লডিয়ান আসছে তার বিশাল বাহিনী নিয়ে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আসছে?

সমুদ্রতীরে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার না রক্ষাব্যূহ ছিল?

হ্যাঁ, আছে। এখনো আছে।

কেন সেগুলো ব্যবহার করছ না?

পারছি না। ক্লডিয়ানের দল জ্যাম করে দিয়েছে।

তোমরা কোনো বাধা দিচ্ছ না? আঘাত করছ না?

টুবু আস্তে আস্তে বলল, রুকাস চাইছে না।

আমি রুকাসের দিকে তাকালাম, রুকাস?

রুকাস শান্ত মুখে বসে ছিল, বলল, আজ থেকে দু'হাজার বছর পরের অস্ত্রের কথা তুমি জান না। ক্লডিয়ানের সাথে যদি এখানে সম্মুখযুদ্ধ শুরু করা হয়, তোমাদের শহর, নগর সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

যে সত্যটির জন্যে ক্লডিয়ান আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সেটি আমার লোকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার জন্যে—একটি মানুষের জন্যে আমি এতবড় বিপর্যয় ঘটতে দিতে পারি না।

তুমি কি ভবিষ্যতে চলে যেতে পার না?

এখন আর পারি না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি?

ক্লডিয়ানের দল যদি চায়, ভবিষ্যতে গিয়েও আমাকে খুঁজে বের করবে। তার প্রয়োজন নেই।

রুকাস উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল টুবু।

কোথায় যাচ্ছ?

সমুদ্রতীরে। ক্লডিয়ানের সাথে দেখা করতে।

টুবুর ভাবলেশহীন ধাতব মুখে অনুভূতির কোনো চিহ্ন নেই। সে ধীরে ধীরে নিজের বুকের একটা অংশ খুলে একটি অস্ত্র বের করে দেয়, প্রাচীনকালের অস্ত্রের মতো। ছোট একটি হাতলে ধরে ট্রিগার টানতে হয়। সামনে ছোট নল, ভেতর থেকে বুলেট বের

হয়ে আসে।

টুবু বলল, এটি বিংশ শতাব্দীর অস্ত্র। পুরোটা যান্ত্রিক। এর মাঝে কোনো ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ ওটাকে জ্যাম করতে পারবে না। ভেতরের বুলেটগুলি অনেক শক্তিশালী, বায়োবটের যান্ত্রিক দেহ ভেদ করে ভেতরে যেতে পারবে।

কি নাম এটার?

রিভলভার। কাছে থেকে গুলি করতে হয়। আর শোন, আমি নিশ্চিত, ক্লডিয়ানেরা এই এলাকার পুরো ইলেকট্রনিক সার্কিট জ্যাম করে দেবে। আমি সম্ভবত পুরোপুরি বিকল হয়ে যাব। যদি তোমার সাথে আমি আর কথা বলতে না পারি, তাহলে এই হবে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ।

রুকাস এগিয়ে এসে টুবুকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, আমি দেখতে পাই রুকাসের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। রুকাস টুবুকে ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমাকে আলিঙ্গন করে বলে, কুনিল, আমার যদি উপায় থাকত আমি তাহলে এখানেই থেকে যেতাম।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুনিল আমার মায়ের দিকে এগিয়ে যায়। মা তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার প্রথম ছেলেটি খুব অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল, তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি বুঝি আমার সেই ছেলে, ফিরে এসেছ।

রুকাস বলল, আপনি আমার জন্মদাত্রী মা নন, কিন্তু আপনি আমার মা। আপনাকে দেখে আমি বুঝেছি, আমি ভালবাসার কত বড় কাঙাল।

মা রুকাসকে ছেড়ে দিলেন। রুকাস মাথা নিচু করে ঘুরে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বের হয়ে গেল। টুবু ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল, বলল, বিদায়। তারপর সেও রুকাসের পিছু পিছু বের হয়ে গেল।

আমি মায়ের হাত ধরে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম রুকাস আর টুবু হেঁটে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাতের আকাশ বিন্দু বিন্দু আলোতে ভরে যাচ্ছে, আগে কখনো দেখি নি, কিন্তু তবু আমার বুঝতে বাকি থাকে না, বায়োবটের বিশাল বাহিনী নেমে আসছে সমুদ্রতীরে।

রাত্রিটা ছিল আশ্চর্য রকম নীরব। রাতজাগা একটা পাখি হঠাৎ করুণ স্বরে ডেকে ডেকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, পাখির করুণ চিৎকারে আমার বুকটা হঠাৎ হা হা করে ওঠে। ঠিক তখন আমার কিরীণার কথা মনে পড়ল। কিরীণা কি তার অলৌকিক কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষাদের একটা সুরে ক্লডিয়ানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে না? আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, মা, আমাকে যেতে হবে।

কোথায়?

কিরীণার কাছে।

কেন?

পরে বলব মা তোমাকে, এখন সময় নেই।

মা বাধা দেবার আগে আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। কিরীণাদের বাসা খুব কাছে, সে ঘুমায় বাইরের দিকে একটি ঘরে। আমি জানালায় শব্দ করে চাপা স্বরে

ডেকে বললাম, কিরীণা।

কিরীণার ঘুম খুব হালকা, সে সাথে সাথে উঠে বসে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, কে?

আমি কুনিল।

কী হয়েছে কুনিল?

রুকাস চলে গেছে।

কোথায়?

সমুদ্রতীরে, ক্লডিয়ানের সাথে মুখোমুখি হতে।

সর্বনাশ!

কিরীণা।

কি?

তুমি কি যাবে রুকাসকে বাঁচাতে?

আমি! কিরীণা অবাক হয়ে বলল, আমি?

হ্যাঁ।

আমি কেমন করে রুকাসকে বাঁচাব?

বলব আমি তোমাকে, তুমি বের হয়ে এস। দেরি কোরো না, সময় নেই আমাদের মোটেই।

কিছুক্ষণেই রাতের অন্ধকারে আমি কিরীণার হাত ধরে ছুটে যেতে থাকি।

আকাশে বড় একটা চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোতে আমি দেখতে পাই রুকাস সমুদ্রের বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে তার চুল উড়ছে, কাপড় উড়ছে। আশেপাশে কোথাও টুবু নেই। সত্যি কি তার ইলেকট্রনিক সার্কিট জ্যাম করে বিকল করে দিয়েছে?

আমি কিরীণাকে নিয়ে রুকাসের কাছাকাছি একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

বিশাল বায়োবট-বাহিনী ধীরে ধীরে নেমে আসছে। অন্ধকারে জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে তাদের আলো। মাটির কাছাকাছি এসে অতিকায় মহাকাশযানগুলো স্থির হয়ে গেল। গোল গোল দরজা খুলে বায়োবটেরা নামতে থাকে অস্ত্র হাতে। ধীরে ধীরে তারা ঘিরে ফেলছে রুকাসকে। ইচ্ছে করলেই তারা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে তাকে। কিন্তু তারা রুকাসকে আঘাত করল না।

আমি দেখতে পেলাম এক জন দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে রুকাসের দিকে। আমি চিনতে পারলাম তাকে, ক্লডিয়ান।

রুকাসের খুব কাছাকাছি এসে ক্লডিয়ান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রুকাস বলল, তুমি ক্লডিয়ান?

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি আর তুমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সময়ে নয়, দুই সহস্র বছর অতীতে!

আমি তোমাকে হত্যা করতে এসেছি রুকাস।

আমি জানি। রুকাস শান্ত গলায় বলল, আমাকে আগে কখনো কেউ হত্যা করতে

পারে নি ক্রুডিয়ান। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাকে রক্ষা করেছিল। আমার মৃত্যু হলে সময় পরিভ্রমণের দ্বিতীয় সূত্রটি লঙ্ঘিত হত। এখন সেটি আর সত্যি নয়। আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি ক্রুডিয়ান। এখন সম্ভবত তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে। তবে তোমাকে দেখার জন্যে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে।

ক্রুডিয়ান ধীরে ধীরে হাতের অস্ত্র উদ্যত করে। শান্ত গলায় বলে, রুকাস, তুমি অস্ত্র বের কর।

আমি ফিসফিস করে কিরীণাকে বললাম, কিরীণা, চোখ বন্ধ কর কিরীণা।

কিরীণা চোখ বন্ধ করল। আমি বললাম, মনে কর তুমি দাঁড়িয়ে আছ সমুদ্রতীরে, সমুদ্রের বাতাসে তোমার চুল উড়ছে। তোমার কাপড় উড়ছে। তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা শিশু, তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে ট্রন। শিশুটি সেটা জানে না, সে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, অপেক্ষা করছে তার বাবার জন্যে। শিশুটির মা তুমি, তোমার বুক ভেঙে যাচ্ছে দুঃখে, তবু দুঃখ বুকে চেপে তুমি ডাকছ শিশুটিকে, করুণ সুরে, ভয়ঙ্কর করুণ সুরে। ডাক কিরীণা, ডাক। আমি তীব্র স্বরে বললাম, তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ডাক সেই দুঃখী শিশুকে—

কিরীণা তার বহু-পরিচিত গানটি গাইতে শুরু করল। সমুদ্রের বাতাসে ঝাউবনের যে করুণ সুর শোনা যায়, সেই সুরের সাথে মিলিয়ে, সুরেলা করে।

বড় দুঃখের গান, আমার চোখ ভিজে আসে, আমি ঝাপসা চোখে দেখতে পাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুডিয়ান। নিশিরাতে সমুদ্রের বালুবেলায় মুগ্ধ হয়ে ক্রুডিয়ান শুনছে এক নিষিদ্ধ সংগীত। আমি দেখলাম থরথর করে কাঁপছে ক্রুডিয়ান, কাঁপতে কাঁপতে সে কোনোভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে, পারছে না। দুই হাতে সে নিজের কান চেপে ধরল, তারপর হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল নিচে।

রুকাস তার হাতের রিভলভারটি উদ্যত করে এগিয়ে যায় ক্রুডিয়ানের দিকে, ফিসফিস করে বলে, আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে হত্যা করতে পারি ক্রুডিয়ান, ইচ্ছে করলেই পারি। কিন্তু আমি করব না। কেন করব না জান? কারণ তুমি দুর্বল। তুমি মহা-শক্তিশালী বায়োবট অধিপতি নও ক্রুডিয়ান, তুমি দুর্বল এক জন মানুষ। তুমি এক জন মানুষ, আমার মতো এক জন মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করা যায় না।

রুকাস ক্রুডিয়ানের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, ওঠ ক্রুডিয়ান।

ক্রুডিয়ান খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নিশিরাতে বালুবেলায় অসংখ্য বায়োবট মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

১০. শেষ কথা

সন্ধেবেলা সমুদ্রের তীর দিয়ে আমি আর কিরীণা হেঁটে যাচ্ছি। আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে আমাদের প্রথম সন্তান, রুকাস। অসম্ভব দুরন্ত শিশু, যার নামে তার নাম রেখেছি, তার সাথে কোনো মিল নেই।

কিরীণার গর্ভে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে তার নাম রাখব ইরিনা, ছেলে হলে ক্রুডিয়ান।